KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 23/3 24/1 24/2 (Special NO.) 24/2 (Special NO.) 24/4 25/3	Year of Publication : March 1959 Sep 1959 Jan 1960 (আষাঢ় ১৩৬৭) (চৈত্র ১৩৬৭) Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩

বুদ্ধদেব বসুর পত্র-প্রবন্ধ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্রাজিৎ দত্ত ও
সুবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ ও আলোচনা

—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
তারাপদ রায়, গোপাল ভৌমিক,
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্যের
কবিতা

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ ক্রমিক সংখ্যা ১০৪

বুদ্ধদেব বসুর পত্র-প্রবন্ধ

নিপ্পনি ইংরেজি : মার্কিনি সাহিত্য : মায়াকভস্কি

—

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই মেরু : সত্রাজিৎ দত্ত ● সুধীন্দ্রনাথের গদ্য : সুবীর রায়চৌধুরী

—

কবিতাগুচ্ছ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য,
তারাপদ রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রেয়কণা রায়, গোপাল ভৌমিক, দীপান্বিতা ভট্টাচার্য,
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দোলাচল

কবিতা

বর্ষ ২১
বর্ষ ২২
বর্ষ ২৩
ও বর্ষ ২৪-এর
সম্পূর্ণ সেট
পাওয়া যাচ্ছে।
বহু মূল্যবান কবিতা
অনুবাদ-কবিতা
ও
প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।
প্রতি সংখ্যা ১।০*
প্রতি সেট পাঁচ টাকা
মাশুল স্বতন্ত্র

* 'কবিতা'র শততম সংখ্যা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসংখ্যা—প্রত্যেকটির মূল্য দু-টাকা

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতিসাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

কবিতা
চৈত্র ১৩৬৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ ক্রমিক সংখ্যা ১০৪

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

[১২৯৪—১৩৬৭]

একে-একে সেই কিন্নরদল অন্তর্হিত হলেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যাঁদের শেষ প্রতিভূ। আভিজাত্যের সর্ব লক্ষণ হারাবার জন্য বদ্ধপরিকর এই যুগ; কিছুকালের ব্যবধানে পর-পর রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তর মৃত্যু কেবলি একের পর এক অপূরণীয় শূন্যতা রচনা ক'রে দিয়ে গেলো।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই তিন মনীষা এমন একটি কৌলীন্যের প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন যার শেষ চিহ্ন বলতে এখন আর কেউ রইলেন না। একই সামান্য লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত ছিলেন তিনজনে, যে-লক্ষণের কবচকুণ্ডল—বলা যায়—ক্লাসিক মানস। ফলে, অত্যন্ত স্বল্পকালের ভিতর এই-যে তিনটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোভাব ঘ'টে গেলো তা যেন একটি বিশেষ দিকে আমাদের কাতর অভিনিবেশ দাবি করতে চাচ্ছে: নিতান্তই কাকতালীয় সমাপতন হ'লেও এর ভিতরে যেন দৈবের কোনো বিমুখ মনোভাবকে আবিষ্কার ক'রে নিতে পারা যায়।

শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, যুক্তিনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, মাত্রাজ্ঞান ও সংশয়ধর্ম—এঁদের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলেই এইসব কথা সারি-সারি ভিড় ক'রে আসে। পাথরের মিনারের চারপাশ ঘিরে সুনিশ্চিত সিঁড়িগণ যেমন স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে এগোয়, তেমনিভাবে তাঁদের যুক্তিনির্ভর রচনাবলি অমোঘরূপে মূল বক্তব্যটিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়ে যায়। ভুলছি না যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবি ছিলেন; এটাই সেই কারণ যার ফলে কোনো তীব্র কবির নগ্ন ও অকুণ্ঠিত আবেগকে ওই কঠিন ও পরিশীলিত গদ্যের অন্তরালে হীরকচ্ছুরিত দীপ্ত আলো ফেলতে দেখি। আর এই জন্যই বোঝা যায় যে আলোকপ্রাপ্তি ও তার পরবর্তী রোমান্টিক পুনরভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব তিনি। কিন্তু রাজশেখর বসু কি অতুলচন্দ্র গুপ্তর মধ্যে সন্ধিক্ষণের সেই অস্থির দোলাচল বিন্দুমাত্র নেই।

নিশ্চয়ই এখানে কেউ-কেউ প্রমথ চৌধুরীর দিকে অঙ্গুলিসংকেত ক'রে দিতে চাইবেন। আঠারো শতকি ইংরেজ এবং ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের মতো তাঁরও মূলধন ছিলো যুক্তি, এবং কেবলমাত্র যুক্তি। সেইজন্যই যা-কিছু তাঁর অপছন্দ ছিলো, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে হ'লেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের দ্বারা মুহূর্তে তাদের তিনি বিদ্ধ ও বিধ্বস্ত ক'রে দিতে চাচ্ছিলেন। বোধহয় এই দিক থেকে তিনি পোপ-ড্রাইডেনেরই অনুসারী, যাঁদের হাতে এমনকি কবিতার ছন্দমিলও প্রবন্ধ ও আলোচনায় পরিণত হ'তো। শ্লেষ কৌতুক ও ব্যঙ্গের এই শানিত অস্ত্রগুলি রাজশেখর বসুও পরশুরামের ছদ্মবেশে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র আঘাত করার জন্যই বীরবলের মতো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাঁর তূণীরের শরণ নেন নি। ভাষণসংযমের উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি, প্রবন্ধ ও আলোচনাতেও অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ—প্রমথ চৌধুরীর ধাতে যে-বাকসংযমের অভাব ছিলো। অতুলচন্দ্র—যদিও প্রমথ চৌধুরীর আমন্ত্রণ ও উৎসাহ তাঁকে সাহিত্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলো—সন্দর্ভ ও নিবন্ধের ক্ষেত্রে, রাজশেখর বসুর মতোই, প্রসঙ্গচ্যুতির অনুরাগী ছিলেন না। পরশুরাম সত্ত্বেও মনের দিক থেকে তিনি বোধ করি বসু-মহাশয়েরই সহযোগী। এই কথাটি আরো বিশদ করার যোগ্য।

রাজশেখর বসু ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত—উভয়েরই মনীষা যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলো; সমান অভিরুচি ছিলো সংস্কৃত সাহিত্য ও য়োরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে; এবং কেবলমাত্র তা-ই নয়, এই দুইয়ের ভিতর বিনিময়, যোগাযোগ ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সুষ্ঠু একটি সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। যুক্তির পরাকাষ্ঠা যার জন্ম দেয়, সেই নিস্পৃহ নিরাসক্তি উভয়েরই রচনার বৈশিষ্ট্য। মোহমুক্তভাবে সব কিছুর দিকে তাকাবার ক্ষমতা ছিলো, প্রাঞ্জলতা অন্বিষ্ট ছিলো ব'লে অবান্তর আতিশয্য ও বাগাড়ম্বর কোনো দিনই তাঁদের অভিনিবেশকে লক্ষ্যচ্যুত ও পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। বৈজ্ঞানিকের মতো সব কিছুকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন দু'জনে—আর এই মানসতার পিছনে নিশ্চয়ই উভয়ের কর্মজীবন সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। রাজশেখর বসুকে যেমনভাবে আধুনিক বাংলাভাষার ব্যবহারযোগ্য একটি অভিধান রচনায় ব্যাপৃত হ'তে হয়েছিলো, প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সংশ্লেষসাধন ক'রে নতুনতর এক কাব্যজিজ্ঞাসা রচনায় অতুলচন্দ্রও তেমনি তাঁর উদ্যমকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আর, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত উভয়েই বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন: কোনো রকম সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হ'লে নিঃসংকোচে তাঁদের নিকট উপস্থিত হওয়া যেতো—তা সে বঙ্গবিহার সংযুক্তিপ্রস্তাবের বিরোধী আন্দোলনই হোক বা ভাষা কমিশনের 'কুখ্যাত' বিবৃতির প্রতিবাদই হোক। যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল মাঝারিদেরই আধিপত্য, সেই সময়ে তাঁদের রচনাবলির মধ্য থেকে এমন এক নক্ষত্রকিরণ বিচ্ছুরিত হয় যা মনের অতিবিরল সম্ভ্রান্তি ও কৌলীন্যের ঘোষণা ক'রে দেয়। সেই সম্ভ্রান্তিকে যদি এক কথায় বোঝাতে হয়, তবে বলা যায় মনুষ্যত্বেরই একটি অনাবিল আভা। এই দিক থেকে এঁরা তাঁদেরই সমগোত্রীয়, যাঁদের পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং কিছুকাল আগেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের মধ্যে যার বিকাশ দেখেছি।

২

পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভূত রংপুরে জন্ম হয়েছিলো অতুলচন্দ্রের। দর্শনশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আইন পড়েছিলেন তিনি, প্রথমে রংপুরেই আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন, পরে কলকাতায় এসে ব্যবহারজীবী হিশেবে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্যর আশুতোষের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন কিছুকাল। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' যে-লেখককুলের সৃষ্টি করেছিলো, অতুলচন্দ্র ছিলেন তাঁদের পুরোধা। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রসঙ্গত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'তিনি নিজের চিত্তের জোরে নিজের মতো ক'রেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ ক'রে প্রকাশ করতে পারেন।……চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নতুনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।' সাধারণত যাঁদের 'লেখকদের লেখক' বলা হ'য়ে থাকে, অতুলচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। পরবর্তী কালে হয়তো এমন হবে, যখন অনেকে অতুলচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করবেন; কিন্তু তখনো তাঁর রচনাবলি আমাদের আগ্রহ ও রুচিকে

শিক্ষিত ক'রে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করবে। লিখেছিলেন নন্দনতত্ত্ব, শিক্ষা ও সভ্যতা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজনীতি সম্বন্ধে, কিন্তু এদেরই ভিতর তাঁর ক্ষুদ্র একটি পত্রগুচ্ছের সংকলন 'নদীপথে' তার স্নিগ্ধ সুষমার দ্বারা এক সৃষ্টিশীল অভিলাষের দিকে সংকেত করে। অন্তত এটাই দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি বহু-কথিত উক্তিকে তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে : তাঁর রচনাবলি যা প্রমাণ করে, অতুলচন্দ্র তার চেয়েও বড়ো সাহিত্যিক ছিলেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ভিতর এমন একটি উদ্দীপিত ঔদার্য ও সুদৃঢ় পৌরুষ ছিলো যা বাংলা সাহিত্যে অতিবিরল। তাঁর পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ-ক্ষমতা তাঁর ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থপঞ্জীকে অসাধারণ তাৎপর্য দিয়েছে। নিরহংকার, নিরাসক্ত ও পৌরুষমণ্ডিত এই অস্মিতা কখনো সাময়িক করতালি কি অনুগ্রহের প্রত্যাশায় পথভ্রষ্ট হননি। এই অসামান্য আভিজাত্যের তিরোধান আলোকপ্রাপ্ত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি বিপুল যুগের অবসান ঘটিয়ে দিলো—অবশেষে শেষ কিন্নরটিও এই বামনশাসিত যুগের হাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সব ভার তুলে দিয়ে অপসৃত হলেন।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটি ভুল প্রায়শ্চিত্ত

অনুতাপের সিঁড়িতে শুয়ে আছে
আমার বন্ধু, আরেকটু হ'লেই
প'ড়ে যাবে সদর রাস্তায় ;
গর্হিত পাপ বরং লুকোলেই

ভালো লাগতো আমার হৃদয় মনে :
কিন্তু ভাখো, ঈশ্বরের পা
ধরবে ব'লে কদর্য হাত মেলে
নিতে চাচ্ছে ঋষির শিরোপা।

আমি যে আর সইতে পারছি না—
জটাজটসমন্বিত ক্ষোভে
এতদিনের সঞ্চিত দখিনা
ও কি শেষে গঙ্গাজলে ধোবে !

ও কি শেষে বুকের হাড় খুলে
আপন হাতে জ্বালবে নিজের চিতা ;
অসামাজিক একটি রক্ষিতা
কেন ওকে নেয় না চরণমূলে ?

ঘৃণা

তবু পুব হাওয়া না-বুঝে তর্ক করে,
বোঝে না আমার উপায় ছিলো না কোনো,
বোঝে না আমি যে নমিতার শেষ ঘরে
গিয়েও পারিনি দায়িত্ব নিতে, ঝড়ে

বল্লরীবাহু এবং আচ্ছাদনও
মেলেছিলো, তবু নিরাপদ অন্তরে
চুম্বন করেছিলাম রক্তব্রণ।

কেননা, নমিতা প্রথম কক্ষে শুধু
উপাসনা নিতে রাজি হয়েছিলো, পূজা
তাকে করেছিলো দিগ্‌ধূ অতিসুদূর ;
অবশেষে কেন তিমিরে সে দশভুজা
হ'তে গেলো ? কেন ভুজমৃণালের উজান
কাঁপা সরসিজে ব্যাপ্ত, ওষ্ঠাধরে ?
জ্ঞানশূন্যতা করলো নিজ অনুজা
প্রথম ঘরের নমিতাকে শেষ ঘরে ॥

অধঃপতন : চারটি সনেট

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১

আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
নির্মলতা-হারা প্রাণ, তবে পূর্বে প্রণতিস্বীকার।
ভালো নির্মলতা, ভালো শান্তি ; জানি সুখের কদরে
আয়ু দীর্ঘতর হ'তো স্নিগ্ধ বারি দীর্ঘিকার !

আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
অজেয়, অমর শ্বেত-পাতার প্রচ্ছন্ন জাগরণ ;
তা কি নয় স্বর্গচ্যুত মন্দার সহসা বুকে ধ'রে
স্পর্শে প্রেতায়িত হওয়া ? তা কি নয় নিশ্চিন্তে মরণ ?

তবুও স্বর্গের মতো কিছু নেই, যা থেকে পতন
হ'তো অধঃভূমে কিংবা পাতালের প্রচণ্ড গহ্বরে।
মর্তের দণ্ডিত মর্তে প'ড়ে থাকে অভ্যর্থনাহীন—
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা কারে বিদ্ধ করে ?

তোমাদের দরজা-জানলা ফুটো-ফাটা বন্ধ ক'রে দাও,
ফুলের বাগানে ভূত মারাত্মক প্রস্রাব ছিটোয়।

২

এ কি আলিঙ্গন ? এ যে ওতপ্রোত গ্রাসের গঠন—
পদতল, মধ্য, মাথা, তাল ক'রে ওষ্ঠ পেতে দেওয়া—
খেতে ও খাওয়াতে। এ কি তামসিক কলঙ্কমোক্ষণ
নিষ্প্রভ প্রাণের ; এ কি বদ্ধমূল স্ববিরোধী খেয়া ?

এবার চুরমার ক'রে দেবে দাও কান্তি-সভ্যতার
প্রয়োগনৈপুণ্য, ধর্ম, ধর্ম-অনুসারে শিল্পরীতি,
বাক্ ও মুমুক্ষা, পরিপুষ্ট কোষে মূর্খ জ্ঞানভার—
সমস্ত চুরমার ক'রে দিতে, বক্ষে থাক্ করো প্রীতি।

এ কি আলিঙ্গন? এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে
আশিরগোড়ালি-নখ। এ কি আলিঙ্গন মানুষের
ঘোরতর? ব্যবধান গ্রাসচ্ছলনার অন্তরালে
অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের
কাঙ্ক্ষিত শিল্পের কাছে? শিল্প কি বিমূঢ়
অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে?

৩

তোমারে আবহমান কাল থেকে চেয়েছি জানাতে—
আমি ভালোবাসি; আমি সবচেয়ে তোমারই অধীন।
রটেছে, শুনেছো কানে, প্রবঞ্চনা চাতুরী ও হীন
নিশ্চিত শঠতা কত! আদালতে বোবা ও কানাতে
সাক্ষ্য দেয়; কাজী শুধু এ-পাপের শাস্তি মরে খুঁজে।
পাপীর প্রতিভা চায় মুক্তি। আমি মুক্তি মানে বুঝি,
তোমার বুকের 'পরে ব'সে থাকা; গায়ে থাবা গুঁজি—
তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।

জগতে সমস্ত সৃষ্টি ওতপ্রোত মিথ্যা ও ব্যর্থতা
তুমি ছাড়া দয়াময়ী! যুক্ত করো কণ্ঠ ও গরাদে
ফাঁস-মফ্‌চেনে। আমি, স্বরাজের মর্মের বক্রতা
মানে বুঝি, পরিত্যাগ। তোমারে শাসাতে আমি বাদে
এগিয়ে আসে না কেউ; এমনকি ভিক্ষুক সভয়ে
পার হয় খোলা দরজা, যাচ্ঞা বিনা বন্ধ করতাল।

৪

ভালোলাগার আদরে তুমি জাগো না নীরবে
আমি দেখি। ভেসে ওঠে পরিপূর্ণ তীব্র কলকাতায়
অধঃপতনের ধ্বনি। তবু বুকে-শান্তিতে-পাতায়
তোমার বৃষ্টির মতো ঝ'রে পড়া ফলবতী হবে।

না, আমি যাবো না ফেলে পড়ন্তবেলার জাগরণে
সন্ধ্যা নামছে। বহুদিন পরে যেন মৃত্যু থেকে দূরে
তোমায় দেখলাম; হোক মেঘভাঙা আলোক বিধুর
তবু যা-আলোক নয়, স্মৃতি তারে স্পর্শ করে মনে।

বস্তুত পায়ের মাঝে ঢেলে দিলে জাগ্রত দ্যুতিরে,
এ-মুখমণ্ডল হ'তে শুষে নিলে মালিন্য আমার,
তুবড়ে গেলো নৈরাশার অনুমোদিত নিমগ্নতা—
তবু কি পেলাম, যাকে লোকে বলে অপর্ণাতিমিরে
পাওয়া স্বতোজ্জ্বল? যার স্পর্শ লেগে নরকে নামার
সিঁড়ি হবে সাবলীল, স্বর্গ হবে প্রশস্ত দরোজা?

দুটি কবিতা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

বিনিদ্র সংলাপ

অন্ধকার আকাশের নিচে
অবিরল রক্তস্রোতে শুয়ে আছি সারাদিন রাত,
অযুত যোজন থেকে ক্ষীণতম স্বরে
শুনেছি জলের শব্দ দূরে।

চতুর্দিকে বাজনাবাজা আলোজ্বলা দিন
কয়েকটি পীড়িত মুখ, রৌদ্রের মিছিল
বুকের নিভৃত কক্ষে পেতেছে আসন।

পাথরে ফোটাই পেশী, ধ্বংসস্তূপে গান,
চেয়েছি পাইনি শুধু আরেক সন্ধান।

চলমান দৃশ্যপুঞ্জে সময়ের পদশব্দ শুনি,
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মুদ্রাদোষে
বিয়োগান্ত অমর ফাল্গুনী।

আলোর বিশাল কক্ষে যাতায়াত আছে
এমন অতিথি নেই আমাদের কাছে।

নিদ্রাহীন এ-শতক। বিনিদ্র সংলাপ।
প্রাগৈতিহাসিক স্বরে রক্তের বিষণ্ণ অন্তঃপুরে
আমরা কয়েকজন সারা দিনরাত
শুনেছি জলের শব্দ দূরে॥

সংগীতের জন্ম

চাঁদ ডুবে গেছে দূরে চতুর্থীর তিথির তিমিরে,
প্রতিবিম্বে চূর্ণ চতুর্দিক ;
স্নায়ুর সর্পিল নদী প্রবল স্রোতের দিকে ফিরে
অন্ধকার স্পর্শ করলো নির্মম নির্ভীক।

যে-গান বাঁধবো ব'লে মধ্যরাত্রে প্রদীপ জ্বালাই
প্রতিটি অক্ষর ধ্বনি ধ্বংসের নিয়মে পরিম্লান,
শেষ দৃশ্যে স্তূপীকৃত ছাই—
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বনিময় ধ্বংসের সে-গান।

আকাশে এখনো রাত্রি, পূর্বাশার আগ্নেয় তোরণ
তন্দ্রাহত। কুশীলব শোণিতাক্ত পঞ্চমাঙ্কে স্থবির,
নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি ক্ষমাহীন মূঢ় শতাব্দীর
অন্ধকার বুকে নিয়ে জাগে পাখি, জাগে শালবন।

খুনের কাহিনী, গীতাভাষ্য, উপনিষদের বাণী
অধুনা নিহিত অর্থে শিষ্ট সমার্থক ;—
মৃত্যুর অপর নাম সংগীত, অন্তিমে শুধু জানি
রাত্রির বিকল্প তুমি, অর্ধমৃত কিংবা পলাতক॥

তিনটি অপ্রাকৃত কবিতা

তারাপদ রায়

দুঃসাহস

একদা সাহসী হবে এই সব ভীত মানবক।
সিংহের কেশর ধ'রে লড়াইয়ে প্রমত্ত হবে তারা,
হাঙ্গর বাহন হ'য়ে ক্ষুরধার সমুদ্রের জলে
অনায়াস ভেসে যাবে ছলে-বলে অথবা কৌশলে।
এবং একদিন হয়তো ইহাদেরই প্রবল প্রতাপে
বাঘে ও গোরুতে মিলে এক ঘাটে এসে জল খাবে।

তথাপি অধুনা তারা নিতান্তই ভেতো, ভীরু, ভিতু ;
দেয়ালে টিকটিকি কিংবা আলমারির কাচে চলমান
লোহিত আরশোলাগুলো দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় :
ইহারা জানে না নাকি, ইহাদেরই আসিছে সময়॥

জীবিত কুকুর

মুক্ত আকাশের নিচে চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে একটি কুকুর,
হা ক'রে রয়েছে শুয়ে নির্লিপ্ত নয়নে ফ্যাথে চেয়ে
নীল-শাদা পাখি-মেঘ ; আসন্ন শরতে
এ-সব বদলিয়ে যাবে এক আকাশ হিমেভরা মিহি কুয়াশায়।

'এত মিহি জমিনের শাড়ি, এত নীল তাকে কি মানাবে,'
তার কোনো চিন্তা নেই ;
দক্ষিণ কি উত্তরের হিমার্দ্র বাতাসে
কোনো ম্লান অনুভূতি নেই
পরম নিশ্চিন্ত এক অবোধ কুকুর॥

তরুণ কবির প্রতি

সে-সিঁড়ি কোথাও নেই, কোনোদিন নন্দনকাননে
পৌঁছোতে পারবে না তুমি ; কেউ-কেউ নিশ্চয়ই যাবে,
কিন্তু তাঁরা ক্ষণজন্মা, ঈর্ষা ক'রে কী যে ফল পাবে
কিছুই পাবে না তুমি, তার চেয়ে ভঙ্গ দিয়ো রণে।

ইচ্ছে হ'লে মিশে যেতে পারো সমতল জনতায়,
নানা ভিড়ে ; দাঁতের মাজন বেচে গরিব দালাল ;
কেউ-কেউ বানর নাচায়, ভাঙা ডুগডুগিতে তাল
তেমন জমে না, তবু চতুর্দিকে লোক জ'মে যায়।

অবশ্য তুমিও হয়তো তাই চেয়েছিলে, কিছু ভিড়,
কিঞ্চিৎ নজরানা আর দুর্লভ স্বর্গের সিঁড়ি যদি
ভাগ্যবলে করায়ত্ত হয়, জন্ম যৌবন অবধি
তাই ভেবে দিন গেলো দিন বড়ো চতুর গভীর॥

উপসর্গ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

কবিত্বে কি প্রয়োজন ছিলো ? শব্দ, সুমন্দ্রিত ধ্বনির উচ্ছ্বাসে
অমরতা চাহিনি তো ; দৃষ্টির সমর্থ বুদ্ধি সবিনয় ক্ষোভে
নিজের সুস্পষ্ট হাতে কররেখা পড়তে পারে, কোন দীপ্তরেখা
রাজচক্রবর্তী হবে এ-কথা বলেনি ভ্রমে ; তবু নিশাকালে
কবিতা জ্বালায়ে রাখি, জন্ম থেকে একাকিত্বে বুঝি ভয় ছিলো।

শিল্পকে বর্জন ক'রে যদি বাঁচতে পারি, যদি জাগরণ
বিস্ফোরণে আবর্তিত, সমুদ্রের তলদেশে সক্ষম জোনাকি
উড়তে থাকে—বিরাট মাছের পুচ্ছে ঘা খেয়ে তবুও তুচ্ছ
প্রাণ অকম্পিত জলে, তাহ'লে শব্দের ভার, ধ্বনির সমিধ
বহনে জটিল যজ্ঞে কিবা লাভ ! পৃথিবীতে বহুকাল শুধু
নিজেকে জাগায়ে রাখা, উপবনে নিদ্রাহীন রণবাদ্যে ঘোর
অস্থির অনন্ত নৃত্যে মগ্ন থাকা একমাত্র। অন্য সব মৃত
যাবতীয় উপসর্গ—শিল্প, শব্দ, ধ্বনির উপমা !

দুটি কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝিনুকের মৃত্যু

জঞ্জাল, মাছের কানকো, ছাইপাঁশ স্তূপ হ'য়ে ছিলো।
কোথাও গোপনে তবু বদ্ধমূল আলোকের ফুল
দ্ব্যর্থহীন ডাকে তারে অন্ধকারে আরক্ত, নির্ভুল :
তিক্তের বলয় ফেটে গাছ ফোটে, কুন্তিল নিখিলও
অবিরাম পরিশ্রমে দায়িত্বেরে ছাপে মোহ্যমান—
উপমা, কবির স্নেহ, করুণার মত্ত পরিমল
পবনে ছড়িয়ে যায়, সপ্রতিভ সকল সম্বল
শূন্যতায় ঝ'রে পড়ে—ওঠে গাছ, প্রতিশ্রুত প্রাণ।

অসতর্ক দিগন্তের স্বতঃপ্রভ প্রবল অতলে
কনক ছায়ার মতো নক্ষত্রের অভ্যর্থনায়
উপদ্রুত পতাকার চঞ্চলতা ঘুরে-ঘুরে যায়,
বন্দরের শেষ চিহ্ন ডুবে গেলো সেইখানে জলে।
শূন্যতা বিদীর্ণ ক'রে স্রোতোময় কুহকের খেতে
বর্বর শাঁখের স্বরে শুশুকের স্বাধীন উত্থান—
দুরূহ বিমান হানে জাদুকর হাওয়ার পুরাণ
অবোধ পোতের পালে সংশয়ের প্রমত্ত সংকেতে।

সঙ্গীসাথী যারা ছিলো বিসংবাদী নির্বেদে বধির,
অনিচ্ছুক প'ড়ে থাকে ক্ষমাহীন হা-করা পাতালে :
রক্ত, গন্ধ, নিঃসরণ অনর্গল রূপান্তর জালে
শ্যাওলা, শামুক, হাড়ে, প্রবালের শিখায় সুস্থির।

প্রতিবিম্ব কম্পমান, কুয়াশার রশ্মি ঢাকে স্মৃতি ;
অনিশ্চয় লুপ্ত হ'লে ঢেউ, ঝড়, স্রোতের বিস্তার

হারানো আরেক দিন—রৌদ্র, তৃষা, হতাশার ভার—
ছড়ায় দিগন্ত জুড়ে কৃষ্ণকায় খনির নিভৃতি।
ব্যগ্র নিষ্পলক চোখ খোঁজে শ্বেত অঙ্গারের ধার,
যা দেবে, অন্ধকারে, উদ্ধারের অব্যয় সংগতি।

অস্থির স্মৃতির তীব্র বেগবান নিষ্পলক চাপে
নাবিকের হাত কাঁপে সর্বনেশে শিথিল স্পন্দনে ;
তুফান, বাঘের থাবা, সুযোগসন্ধানী আক্রমণে
দুর্নিবার লাফ দেয়, দ্বন্দ্বের প্রখর অভিশাপে
স্তব্ধের উদ্ধার আসে—অবশেষে—চরম প্লাবনে।
—শুক্তির স্বপ্নের বৃন্ত প্রভাস্বর লুপ্তির উত্তাপে ॥

কুহকের দ্বার

স্ফটিকেরা অন্ধকারে রুপোর পালক হ'লো ধীরে,
ঘর যেন ত্রিমাস্তুল অর্বাচীন তরী, যার পাল
সমুদ্রের ডাক শোনে স্রোতে, ঝড়ে, আরক্ত তিমিরে,
জেটির অলীক সিঁড়ি ছুঁয়ে থাকে অমল দেয়াল।

চকিতে জানেলা সব খুলে যায় প্রবল হাওয়ায় :
শয্যাশায়ী তার মতো হুবহু আরেকজন একা—
(কে জানে কোথায় ছিলো, এলো কোন অন্ধকার থেকে)
পেরিয়ে দড়ির সিঁড়ি পাটাতনে সুস্থির দাঁড়ায়।

লোহার অঙ্কুশ কাঁপে, এইবার ঘূর্ণির এলেকা ;
তাসের মিনার ধ্বসে, দুরন্ত অরণ্য এঁকেবেঁকে
দূরান্তে মিলিয়ে যায়, পথ ছোটে চঞ্চলের দিকে,—
রুপোলি কুয়াশা, হাওয়া, নীল রাত সম্ভাবনায়
তারায়-তারায় জ্বালে অসহ্যের উদ্দীপক শিখা।

মর্মরগভীর পথে কুহকের শূন্যতার মেঘ
অনিবার্য নক্ষত্রের তিনবিন্দু সোনালি পাহারা :
দিগন্তে সুপ্তির গানে উপকূলে স্নেহের আবেগ,
অচেনা বন্দর ছোঁয় স্তব্ধের বর্বর চীৎকারে
সিঁড়ির অমূল রেখা, ধাপে-ধাপে জলন্ত ইশারা—
না-নেমে উপায় নেই—একা, এই সমুদ্রের তীরে।

বেদনা, ধবল শঙ্খ, লাল বালি, জাফরান সুদূর,
দিগন্তের কালো বন—সব পথ শেষ হ'লে পরে
বিশাল তোরণদ্বারে বুরুজের উজ্জ্বল লণ্ঠন ;
চন্দন, করুণ ছায়া, সূর্যাস্তের রশ্মির প্লাবন
কেঁপে ওঠে স্রোতে, পথে, নীলিমার ক্লান্ত অবসরে
যেখানে, মায়ার মতো, দ্যুতির পাখায় বাজে সুর।

যখন মাংসের ভোজে বেশামাল পোকার আহ্লাদ
নিরঙ্কুশ জ'মে ওঠে জীর্ণ তার নিঃসাড় শরীরে,
তখনি রূপের ঊষা অলৌকিক বিভার সংবাদ
পাঠালো অব্যয় স্বরে, চরাচরে, লুপ্তির তিমিরে ॥

ত্রিবর্গ-সার

শ্রেয়কণা রায়

সে-এক আশ্চর্য দেশ : কাচ-কাঠ-সীমা দিয়ে ঘেরা,
পুরোনো বই-এর গন্ধে বন্দী হ'য়ে আছে লোভী মেয়ে।
রোজ তার খোঁজ নেই রবীন্দ্র-রচনাবলি বেয়ে
সাধক-চরিতে নিত্য কম্পিত আঙুল দিয়ে ধরা।
ওর কোনো ভয় নেই ; তাই ছাখো নির্জন দুপুর
জ্যোৎস্নাভিসারের মতো অপূর্ব আলোকে নৃত্যপরা।
ঘরটা তো অন্ধকার, জানলাতেও বাঁধা শক্ত তার
আলমারি বেয়ে-বেয়ে নিঃসঙ্গ লুকোচুরি করা।
বাংলা বই নেবে ব'লে কদাচিৎ কেউ চ'লে আসে
ও-মেয়ে যে কোন স্বর্গে লুপ্ত থাকে ওই তো তা জানে
অন্যজন মাঝে-মাঝে বিলম্বিত স্বগতোক্তি শোনে—
'সব ভালোবাসা যার বোঝা হ'লো দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।'

সে-এক আশ্চর্য মন : সমুদ্রই একমাত্র স্বাদু—
এই জেনে থেকে-থেকে ক'রে বসে নীলিম-প্রত্যাশা,
উন্মত্ত অধীর হ'য়ে ভাব পাতানোই ভালোবাসা ;
না-না ক'রে ছেড়ে দিলে ছোঁয়া থাকে অবিচ্ছেদ্য জাদু।

সে-এক আশ্চর্য মায়া : যে-মায়ায় সব ভুলে গিয়ে
ফের নিতে ইচ্ছে করে জীবন্মৃত সংসারের ভার।
ভগবানই একমাত্র ভাগ্যবান, তা না-হ'লে আর
মানুষ কি পেতে পারে লৌকিক অলৌকিক ছুয়ে !

দুষ্মন্ত-বিলাপ

গোপাল ভৌমিক

শীতে আমি ভীত নই
বরং ফাল্গুনে পাই ভয় :
মদ-রং নেশা যার
মন-রাঙা সোনালি সময়
কোনো দিন ছিলো কিনা
ভেবে দেখা হয়নি জীবনে।
অথচ সে-কিশলয়
সুগোপন শীতের স্বপনে।

শীত তো জানিয়ে আসে,
হাড়ে লাগে বিষম কাঁপুনি ;
ফাল্গুন গোপনচারী
প্রেমিক বা খুনী
যা কিছু সে হ'তে পারে।
তাকে নিয়ে তাই এত জ্বালা,
সব তার প্রায় এক
আগমনী বিদায়ের পালা।

শীত আসে শীত যায়,
মাঝখানে দুরন্ত ফাল্গুন—
অপগত শরগুলি
কুড়িয়ে যদিই ভরে তূণ
আমি তার কতটুকু জানি।
অথচ সে-শরাঘাতে
অতীতের প্রতীতি জাগালে
বুঝি সে রয়েছে সাথে-সাথে।

ভুল

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

যদি দিয়ে যেতে পারো এইখানে আমার নিভৃতে—
যেখানে এখনো আছি দুর্বিষহ অভেদ্য তিমিরে—
তমোঘ্ন ভোরের আলো,
দেখে যেয়ো তবে
তারা অশ্রু হ'য়ে কবে ঝ'রে গেছে আমার বাগানে।
কত না বিষণ্ণ রাতে একাকী তোমার কথা ভেবে
মেলেছি বাসন্তী ইচ্ছা ;
অচেনা মুকুল
হঠাৎ ফোটার নেশা, বৃষ্টি-ভেজা মন
আলোর সোহাগ লেগে ঘুম ভেঙে ওঠে কতক্ষণ।

তুমি তা জানবে না জানি, শুধু
আমার বাগান ঘুরে
একটি ফুলের সাধ তোমার খোঁপায় নেবে ভ'রে,
অথবা কিছুই নয়,
দেখে যাবে
একটি ভোরের ফুল ফুটে আছে আমার বাগানে
কত সাধ কত আশা কত কল্পনায় ফোটা মন
তোমার অমনোযোগে অশোভন।
আমার প্রত্যহ দিয়ে ঘেরা এক সাধের পুতুলে
'কিছু নয়' তোমাদের এতটুকু হিশেবের ভুলে।

দেয়ালটা দারুণ শাদা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলো জ্বাললে যেন এক দারুণ অসূয়া
নিমেষে প্রকট হয়। আলো জ্বাললে ঘরের দেয়ালে
যেন খুব হিংসা জ'লে ওঠে।
টেবিল, আলমারি, ছবি—জনে-জনে প্রত্যেকের দিকে
একাগ্র তাকাও ; দেখবে, প্রত্যেকেই সুযোগসন্ধানী।
প্রতিটি নির্জীব বস্তু আপাতনির্জীব।
আসলে প্রত্যেকে ওরা শিকারী জন্তুর
স্থির প্রতীক্ষায় আছে। সুযোগ মিললেই ছিঁড়ে খাবে।

আলো জ্বাললে এই তীব্র ভীষণ অসূয়া
নিমেষে চিত্রিত হয়। আলো জ্বাললে ঘরের দেয়ালে
যেন খুব হিংসা জ'লে ওঠে।
দেয়ালটা দারুণ শাদা। এত বেশি শাদা যে, তোমার
মনে হবে, শুভ্রতার চেয়ে
বড়ো কোনো অহংকার নেই।
বড়ো কোনো হিংসা নেই আলোকের থেকে।
টেবিল, আলমারি, ছবি,—আপাতনির্জীব
এইসব বস্তু তাই উদ্ভাসিত দেয়ালের নিচে
পলকে হিংস্রুক হয় জন্তুর মতন।

আলো জ্বাললে যেন এক দারুণ অসূয়া
নিমেষে প্রকট হয়। আলো জ্বাললে ঘরের দেয়ালে
যেন খুব হিংসা জ'লে ওঠে।

আলোটা জেলো না।

কয়েক হাজার নিশ্বাসের ভিড়ে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তিনটে থেকে ব'সে রয়েছি ওই বুকে মুখ লুকিয়ে রাখবো ব'লে
কেমন তোমার আলেয়া-চোখ, ভিড়ের মধ্যে পাংশু মুখের সভায়
কী হাহাকার শুনতে পেলে, দুটি স্তনের চূড়ার মধ্যে শীতল সমতলে
কয়েক হাজার মুখ লুকোনোর ব্যাকুলতা ; বুকের কাছে হাওয়ার জিহ্বায়
কত কাতর শব্দ উঠলো, স্পষ্ট দেখলে তোমার চতুর্দিকে
কয়েক হাজার ব্যগ্র চোখের, উষ্ণ নিশ্বাসের আগুন জলে।

রৌদ্র জলে আকাশ জুড়ে সাতাশ বছর বন্ধ-করা ঘরে
এ কি ভয়ংকর রৌদ্র, সূর্য যেন দুঃশাসনের রক্ত পান করে
কেমন তোমার আলেয়া-চোখ, আঁচলে মুখ প্রসাধনের ছলে
আমায় একটু চেয়ে দেখলে, লুকিয়ে গেলে নিপুণ ছদ্মবেশে
কোন সমুদ্রে, নির্জনতায়, সন্ধ্যাবেলায় স্রোতের উদ্দেশে।
আমি একলা ব'সে ছিলাম তোমার বুকে মুখ লুকাবো ব'লে।

নিগ্ননি ইংরেজি : মার্কিনি সাহিত্য : মায়াকভস্কি

বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি চিঠি

২৩শে জানুয়ারি ১৯৬১

জ্যোতি,

চলেছি প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হনলুলুর দিকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, মাথার উপর বর্তুল আকাশ নিখুঁত নির্মল ছাতার আকারে ছড়িয়ে আছে, নিচে আর একখানা নীল আকাশ নানা রঙের মেঘ নিয়ে প্রসারিত। সমুদ্র, কিন্তু মেঘের সমুদ্র ; ফেনিল, কিন্তু সে-ফেনা মেঘের, জলের সমুদ্র কত নিচে ধারণা করা যায় না। এখন তেইশ তারিখের বেলা প্রায় তিনটে, আমার ঘড়ির সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ হনলুলু পৌঁছবো, তখন সেখানে হবে তেইশ তারিখের মধ্যরাত্রি। এই সব বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু বিস্মিত হবার মতো বয়স আর আমার নেই, সেটা প্রতিদিন অনুভব ক'রে প্রতিদিন মনে-মনে কষ্ট পাই।

জাপানে দশদিন চমৎকার কাটলো। দুই শহরে গোটা ছয়েক বক্তৃতা, টোকিওতে রেডিওতেও কিছু বলতে হ'লো। অনেক বন্ধু পেলাম, জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তাঁদের সঙ্গে, কিন্তু কে জানে—! অধ্যাপক ওটার স্ত্রী আমাদের জন্য এয়ার-পোর্ট পর্যন্ত এসেছিলেন—প্লেনের দেরি ছিলো, আমাদের জন্য দু-ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, তারপর মাত্র মিনিট দশেকের জন্য দেখা হ'লো। শুধু চোখেরই দেখা, কেননা কথা বলার ভাষা নেই, তাঁর ভাঙা ইংরেজি ও সরল চোখের নম্র শুভেচ্ছা নিয়ে যাত্রা করলাম। কিয়োতোর বন্ধুদের সহৃদয়তাও ভোলার নয়। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ বা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এরা জানে অল্পই, কিন্তু জানবার আগ্রহ আছে, এঁদের বোঝার সুবিধের জন্য আমি অত্যন্ত মোটামুটি মামুলি কথা বলেছি—টোকিওতে আবার আমি এক-একটি বাক্য বলছি, ওটা তার জাপানি অনুবাদ করছেন, এইভাবে বক্তৃতা সারতে হয়েছে। P.E.N.-এর কোনো-এক সভায় ভালেরির বক্তৃতাটা মনে পড়ছিলো, বলছেন—বিভিন্ন ভাষার কবিদের মধ্যে কী ক'রে যোগাযোগ হ'তে পারে—তা অসম্ভব! খুব গোঁড়া মত, পুরোপুরি

মানতে পারি না, কিন্তু এক ফোঁটা সত্যও আছে কথাটায়। তবু জাপানে এসে বার-বার মনে হয়েছে যে আমাদের সাহিত্যের কিছু অনুবাদ হওয়া অতি জরুরি প্রয়োজন এখন—এমনও হ'তে পারে যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো ইংরেজ-মার্কিনের উৎসাহ জাগলো না—আমাদের দিক থেকে কিছু চেষ্টা করা কি যায় না? এটা তোমার কাজ, জ্যোতি, তুমি এ-বিষয়ে চিন্তা কোরো। জাপানিরা আমাদের মনে-মনে ঈর্ষা করে আমরা ইংরেজি ভালো জানি ব'লে—কিন্তু সত্যি ক-জন ভারতীয় ইংরেজি লিখতে পারে, আর তা পারবেই বা কেন, ইংরেজির অধঃপতন আমাদের দেশে অনিবার্য। জাপানে বিদ্বান লোকেরা স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে পারে না—যারা মার্কিনফেরৎ তারাও না, কেননা এদের কাজকর্ম পড়াশুনো সবই মাতৃভাষায়। কিন্তু কোনো-কোনো জাপানি (সংখ্যায় খুব কম তাঁরা) নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ইংরেজি লিখতে শিখেছেন—কেননা জাপানি সাহিত্যের অনেক অনুবাদ স্থানীয় লোকেরাই করেছে। কালক্রমে আমাদের দেশে এই রকম অবস্থা এলে ভালো হয় না কি? কলকাতার কোনো-কোনো অধ্যাপক অনর্গল ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁদের সেই মৃত নিশ্চল আক্ষরিক ইংরেজির চাইতে জাপানিদের ব্যাকরণহীন মৌখিক ইংরেজি অনেক সপ্রাণ বোধ হয়। আমাদের 'শুদ্ধ' ইংরেজি আমাদের দাসত্বের চিহ্ন—ঐ মৌখিক বাগ্মিতার লোভ ছাড়লে হয়তো আমাদের দেশেও দু-চারজন সত্যিকার ইংরেজি লিখতে পারবেন। অবশ্য বিষয়টা ভালো ক'রে ভেবে দেখিনি, কিন্তু সোজা কথাটা এই যে বাংলা সাহিত্যের কিছু ইংরেজি অনুবাদ হওয়া উচিত—বই বেরোনো উচিত—তুমি চেষ্টা করো।

প্লেন বড্ড কাঁপছে, কাগজও ফুরোলো।

বু. ব.

205 West 15th. Street
Apt. I-V, New York 11, N. Y.
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ ; রাত্রি

জ্যোতি,

সেদিন এশিয়া সোসাইটির মিসেস ক্রাউনের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। ছিপ-ছিপে তরুণী সুশ্রী মহিলা, আমার চোখে প্রায় মিমির মতো লাগলো, রকফেলারের টাকায় তৈরি এক ঝকঝকে বাড়ির উজ্জ্বল ঘরে আপিশ করেন। যে-রেস্তোরাঁয় খাওয়ালেন সেটার নাম The Left Bank ; রাস্তা থেকে কয়েক সিঁড়ি নেমে যেতে হয়, চৌখুপি কাপড়ে ঢাকা ক্ষুদ্র টেবিল, চেয়ারগুলো প্রায় পানীয়নের চেয়ারের মতো নড়বড়ে—বুঝলাম, এই প্যারিসীয় দারিদ্র্যের অভিনয়টাই এখানকার আকর্ষণ। মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বেশ লাগলো, খুব সরল ভালোমানুষ গোছের অথচ বুদ্ধিমতী ; বিশেষ কয়েকটা মার্কিনি মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত।

মিসেস ক্রাউনকে গল্পের কথা ব'লে ফেলে এখন ভয়ে-ভয়ে আছি। এখানে ঘরকন্নার কাজ এত করতে হয়, আর এত নিমন্ত্রণ থাকে, যে সত্যি নিবিষ্ট হ'য়ে বসারই সময় পাচ্ছি না। তার উপর ঘরে দিনের আলো নেই, তার উপর পড়ানোর হাঙ্গামাও কম নয়। আমার অদৃষ্টে ছাত্রসংখ্যা মন্দ জোটেনি, তারা মূর্খ নয়, এবং কেউ-কেউ বেজায় উৎসাহী, অচিরেই আমার অজ্ঞতা ধ'রে ফেলবে এইরকম আশা করছি ; তখন আর তথ্য-পরিবেশনের অপচেষ্টা ক'রে ক্লান্ত হ'তে হবে না। যা-ই হোক, কথা হচ্ছে আমার সেই 'একটি জীবন' গল্পটার অনুবাদে কি হাত দেবে এবার? জনরব শুনছি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি আমার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে 'কবিতা'য় ছাপাবার মৎলব আঁটছো—খবরদার, কখনো না, আমি যতদিন সম্পাদক আছি 'কবিতা'য় আমার বিষয়ে আলাদা কোনো প্রবন্ধ বেরোবে না, বড়ো জোর বুক্-রিভিয়ু পর্যন্ত মার্জনীয়। কাজের কাজ হবে যদি ঐ গল্পটা অনুবাদ ক'রে পাঠাও। শক্ত কাজ, কিন্তু তুমি পাত্রটিও তো সোজা নও। লেখা, টাইপ করা, আমার সংশোধন, পুনশ্চ টাইপ—সব মিলিয়ে দু-মাসের ব্যাপার নিশ্চয়ই, হয়তো বেশি। অর্থাৎ, ততদিনে আমি প্রায়

ফিরতি প্লেনের যাত্রী—কিন্তু তবু কিছু দিয়ে যেতে চাই এদের হাতে, আর যা দেখছি এমনি তাড়াহুড়োর মধ্যে ছাড়া কিছুই হ'য়ে ওঠে না আজকাল। আমার লেখার ধরনটা হালকা হচ্ছে, কিন্তু তাই ব'লে আমার অভিপ্রায়ে গুরুত্বের অভাব নেই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

ডরথি নর্ম্যানের সঙ্গেও দেখা হয়েছে এর মধ্যে। ভারতীয় সিল্কের কাপড় প'রে তিনি আমাদের চা খাওয়ালেন; চা-টা যদিও ঈষদ্‌গন্ধী গরম জলের মতো অনুভূত হ'লো, তবু অন্যান্য বিষয়ে তিনি ও তাঁর পরিবেশ এত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর প্রতি চিত্তের উৎসুকতা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। রাহু খুঁটে-খুঁটে দেখতে লাগলো তাঁর ঘরের আসবাবপত্র, গাছপালা,..... আর আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ছবির বই, কবিতার বই, দেয়ালে ঝোলানো ছবি ও ছবির মতোই জীবন্ত ফোটোগ্রাফ, কী অপর্যাপ্ত সংগ্রহ ভদ্রমহিলার। আমার কেবল তোমার কথা মনে হ'তে লাগলো—মনে-মনে কতবার বললাম, 'জ্যোতির এখানে আসা উচিত।' আমার বয়স হ'য়ে গিয়েছে, জীবনের আর নতুন কিছু দেবার নেই আমাকে—রাসবিহারী ছেড়ে ফিফ্‌থ এভিনিউতে এলে সত্যি লাভবান হবার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে। অনেক কিছু না-হ'লেও আমার এখন চ'লে যায়, বরং না-হ'লেই ভালো থাকি। কিন্তু তোমার মনের দগদগে খিদে নিয়ে তুমি এ-রকম একটা জায়গায় এসে পড়লে কতই না সঞ্চয় করতে পারো। তাই ব'লে এমন কথাও ভাবি না যে বিদেশে আসার সত্যি কোনো জরুরি প্রয়োজন আছে। পরিণতির শক্তি থাকলে কোনো দেশেই উপাদানের অভাব হয় না, তুমি তোমার নিজেরই উদ্যমেই নিশ্চয়ই বিকশিত হবে—তোমায় জীবনে অন্য যা-কিছু ঘটছে বা ঘটবে সেগুলো উপলক্ষমাত্র।

George Oppen নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখতে ভালো নয় মানুষটা, কিন্তু তিন মিনিট কথা ব'লেই বুঝলাম তিনি সত্যি কবিতা পড়েন, বোঝেন, ভালোবাসেন। আর-একটু আলাপের পর ধরা পড়লো তিনি নিজেও ঐ পাপকর্মটি ক'রে থাকেন বা এককালে করতেন। যখন বললেন যে 'কবিতা'র ইংরেজি সংখ্যায় আমার কবিতা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, এমন সুর লাগলো কথাটায়

যে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। 'স্মৃতির প্রতি' ১ ও ২ তিনি আমার ইংরেজি থেকে আধুনিক মার্কিনিতে তর্জমা করেছেন—আমার অনুমতি পেলে ছাপাতে চান। কী বলবো, 'আত্মা' হয়তো আমারই, কিন্তু গলার আওয়াজ একেবারেই হাল আমলের মার্কিনি—বাংলাতেও ঐ ধরনটা আমার ইহজন্মে আসবে না। (পরে তোমাকে লেখা দুটো পাঠিয়ে দেবো।) আমার আপত্তি তাঁকে ক্ষীণভাবে বললাম। আমার সহযোগে আমার কবিতা অনুবাদ করা তাঁর ইচ্ছা, খুবই আগ্রহ করলেন। সবই ভালো, কিন্তু সময় কোথায় বলো? ক-দিন পরেই তো পাখি আবার উড়ে যাবে। কথা হচ্ছে, অনন্ত সময় ব্যতীত কিছু হবার কোনো উপায় নেই—অতএব সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাই ভালো। একটি জানলা, কিছুটা আকাশ, আকাশে মেঘ, তাকিয়ে-তাকিয়ে বেলা কেটে গেলো, ভাবতে মন হু-হু ক'রে ওঠে। 'ছিন্নপত্র' পড়েছো?

তোমার পত্র-প্রবন্ধ পাইনি ভেবো না, কিন্তু তার যথাযোগ্য উত্তর লেখার সময় নেই।

বু. ব.

১৯. ৩. ৬১; রাত্রি

জ্যোতি,

ট্রেনে লম্বা পথ পাড়ি দেবার সুযোগে দু-জন কবির সঙ্গে পরিচয় হ'লো। রঁসার, যোলো শতকের ফরাশি, গ্রীক-যাজক, রাজাদের চাটুকার, কপট ধার্মিক, রঁসার। আর-একজন: মায়াকভস্কি, মূর্তিমান বিদ্রোহ ও বিশ-শতক, প্রকাণ্ড, উচ্ছল, ছেলেমানুষ, করুণ। ফ্রেড তোমাকে যে-বইটা দিয়েছিলো, তারই মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখলুম। কবিতা প'ড়ে, জীবনী প'ড়ে, মানুষটাকে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে আমার, থেকে-থেকে মনে পড়ছে, ভুলতে পারছি না। অনেকখানি ভান আছে না কবিতায়? দেখানোপনা? অভিনয়? যেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ডায়েরি লিখে চলেছে, অথচ এমনি অহমিকা যে ভাবছে তার জীবনসংক্রান্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটিও কবিত্বময়, অমর সাহিত্য। নেই

রিলকের প্রচ্ছন্নতা বা পাস্টেরনাক-এর তির্যক ভঙ্গি, সবই চড়া গলার চ্যাচামেচি—ফেনিয়ে-ওঠা, উপচে-পড়া, ছেলেমানুষি করুণ। হুইটম্যান অথবা নজরুল ইসলাম অথবা ডি. এইচ. লরেন্সের মতো—কিন্তু হয়তো তিনজনের চেয়েই ভালো কবি, কেননা বোদলেয়ারের রক্ত ঈষৎ জোলো হ'য়ে মায়াকভস্কির ধমনীতেও বইছে। আশ্চর্য, এই অত হট্টগোলের মধ্যেও বোঝা যায় লোকটা খাঁটি কবি, যেমন গ্রীক অনুকরণের কৃত্রিমতার মধ্য দিয়েও রঁসারকে চিনতে ভুল হয় না। তাও তো অনুবাদে পড়ছি আমরা। বলো তো কী জাদু আছে কবিতায়? বুক দুরদুর করে, চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে, আর নিজেকে মনে হয় ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ। এই মায়াকভস্কির লেখা পড়তে হবে।

আজ সন্ধ্যায় ডরথি নর্ম্যানের পার্টিতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। প্রথমে উল্লেখ্য অ্যালান গিন্‌স্‌বার্গ। তোমার মুখে যার নাম শুনেছি, কিন্তু যার লেখা আমি কিছুই পড়িনি। সম্ভ্রান্ত ককটেল-পার্টিতে একটা গলা-খোলা লাল শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছে (স্পষ্টতই আমার কবিতা পড়েনি); ভারি সুশ্রী দেখতে, আমি দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলেছি, ছেলেটিকে দেখে তোমার কথা বড্ড মনে পড়ছিলো। বললে—আমেরিকার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চলেছে: কেরুয়াক, গিন্‌স্‌বার্গ, আরো কে-কে! 'সুসভ্য' ভারতীয়দের বিস্মৃত সোমরসে দীক্ষাদান এদের মহান ব্রত। আমি বললুম 'সোম' বোধহয় ফরাশি বা ইতালীয় ওয়াইনের মতো নিরীহ দ্রাক্ষারস মাত্র ছিলো, কিন্তু হাক্সলি এদের মগজে যে-ভূত ঢুকিয়েছেন তা তাড়ানো আমার মতো ওঝার কর্ম নয়। এরা বিবিধ নেশার চর্চা ক'রে থাকে—গাঁজা, সিদ্ধি, চরস ইত্যাদি, তুরীয় অবস্থায় কবিতা লেখে, সামাজিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে—অথচ, এই সমস্ত অতি পুরোনো অতি মলিন অতি ব্যবহৃত মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও গিন্‌স্‌বার্গকে আমি অস্বীকার করতে পারলুম না, আমার মনে হ'লো লোকটা সত্যি কিছু খুঁজছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর-দশজনের মতো নয় সে, ভিতরে এক ফোঁটা আগুন জ্বলছে। আমি আবেগের বশে কাল রাত্রে তাকে যেতে ব'লে দিয়েছি, একজন বন্ধু নিয়ে আসবে বলেছে—কী অবস্থায় আসবে, আস্ত দল নিয়েই চড়াও হবে কিনা—এ-সব ভেবে

এখন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছি—কিন্তু ছেলেটির চেহারা স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হ'তে পারছি না।

আরো অনেকের সঙ্গে আজ দেখা হ'লো। ডনাল্ড কীন, জাপানি-অনুবাদক; প্যারিস রিভিয়ুর অন্যতম সম্পাদক সিলভার্স; শ্রীমতী ক্লিমার, অর্থাৎ হাইনরিখ ক্লিমারের বিধবা পত্নী। শেষোক্ত মানুষটির সংস্পর্শে এসে রোমাঞ্চিত হয়েছি;—যদিও জানি উনি ওঁর স্বামী নন, এবং স্বামীর প্রতিভাও ওঁর মধ্যে কিছু বর্তায়নি, তবু আমাদের পৌত্তলিক স্বভাবদোষে যে-কোনো একটি প্রতীক পেলেই আমরা নমস্কার জানাই। উনি বললেন ওঁর স্বামী রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র একটা জর্মান অনুবাদ করেছিলেন, সেটা এখনো ছাপা হয়নি—শুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে। এই তিনজনের সঙ্গেই আবার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে—প্যারিস রিভিয়ুতে হয়তো কিছু বাংলা লেখার অনুবাদ ছাপানো যেতে পারে—যদি তুমি অনুবাদ ক'রে দাও। বাংলার জন্য ডনাল্ড কীন-এর মতো কোনো অনুবাদক যতদিন তৈরি না হয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর ক'রে থাকবো। ওখানে ভেড মেহ্‌টাও ছিলো—হাত-ঝাঁকানি হ'লো আমার সঙ্গে—কথাবার্তা ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেলুম। আর-একজন ভারতীয় ছিলো—সে ইংরেজিতে কবিতা লেখে, সম্পাদকরা ফেরৎ পাঠাবার সময় তাকে মনোরম চিঠি লেখেন—সেটাই তার পক্ষে গর্বের বিষয় মনে হ'লো। এই ইংরেজি-লিখিয়ে ভারতীয়দের মতো বেচারা জীব ভূ-ভারতে নেই—পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো মাটি নেই এদের—যার কোনো মাতৃভাষা নেই তার মতো দুর্ভাগা আর কে আছে বলো। কৌতুকের বিষয় এই যে এরা কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত, কেননা রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন!'

পরশু রাত্রে চ্যাপেল হিল্‌-এ তোমার বয়সী ছেলেমেয়েদের আড্ডায় আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো। তারা অনেকে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে 'বীট' সম্প্রদায়-ভুক্ত; ছেলেরা দাড়ি রাখে, গোঁফ কামায়; মেয়েরা রাখে লম্বা চুল, কালো রঙের মোজা পরে, লিপস্টিক লাগায় না। তাদের সঙ্গে কবিতা বিষয়ে কথা ব'লে সুখ পেয়েছিলাম। আমার অনেক বয়স হ'লো, অথচ আমার মুশকিল এই যে প্রবীণ পণ্ডিত অধ্যাপকীয় সংসর্গে আমাকে ঠিক খা

না—সাহিত্যিক ছেলে-ছোকরাদের মহলে বরং আসর জমাতে পারি ; একটা জীর্ণ দেহের মধ্যে তপ্ত হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত অসংগতভাবে বহন ক'রে বেড়াচ্ছি। তপ্ত ? না—হয়তো তাও ম'রে গেছে, হয়তো শুধু স্মৃতির তাড়নায় ছাইয়ের তলা থেকে মাঝে-মাঝে ফুলকি জ্ব'লে ওঠে—যখন কবিতা পড়ি, কবিদের কথা পড়ি, বা যখন এমন কারো সঙ্গে দেখা হয় কবিতা যার শিরায়-শিরায় বইছে, সমালোচনার কেতাবে আবদ্ধ হ'য়ে নেই।

চ্যাপেল হিল্-এ প্রণবেন্দু বেশ সুনাম রেখে এসেছে, আমার পক্ষে এটা বিশেষ আনন্দের কথা।

মানিক যদি নিউ ইয়র্কে আসে তুমি তার হাতে তোমার উপন্যাস পাঠাতে পারো—অন্তত খানিকটা। এই চিঠি পেয়েই তার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো—কবে রওনা হবে, সত্যি আমেরিকা পর্যন্ত আসবে কিনা, ইত্যাদি। এসেনিন আর মায়াকভস্কির আত্মহত্যার কথা ভেবে আজ নতুন ক'রে কম্পিত হচ্ছি—নতুন ক'রে মনে পড়ছে ডস্টয়েভস্কিকে, কিন্তু মরবার আগেও ওঁরা যদি কবিতা লিখতে পেরেছিলেন, তাহ'লে আত্মহত্যার কী প্রয়োজন ছিলো ?

বু. ব.

Hotel Chelsea
222 West 23rd St,
NY 11
৫ মার্চ ১৯৬১ ; রাত্রি

জ্যোতি,

কাল অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সারা দুপুর কাটানো গেলো, সন্ধেবেলা তিনি আমাদের 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার' দেখাতে নিয়ে গেলেন। বেপাড়ায় একটা ছোট্ট থিয়েটারে অভিনয় হচ্ছে ; দলের লোকেরা অর্ধেক ভারতীয় অর্ধেক মার্কিনি ; এই মার্কিন-ভারতীয় আব্রু ভেদ ক'রে দু-এক ফোঁটা বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক রস যে চুঁইয়ে পড়েছিলো, তাইতে মানতে হ'লো যে 'রাজা' -টায় সারপদার্থ কিছু আছে। পাব্লিক পাকড়াবার জন্য এঁরা অনেক

নিচু স্তরের ব্যাপার ঢুকিয়েছেন। 'ভারত' নামক একটা অদ্ভুত ধারণা নটরাজের মূর্তি, কথাকলির মুখোশ ও দক্ষিনী নাচের মুদ্রায় জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। পাত্রপাত্রীরা 'ওঁ মণিপদ্ম' বলছে—যা রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাট্টা না-ক'রে কেউ বলে না—তার উপর ঐ ফুলেল ইংরেজিও মাঝে-মাঝে কেমন-কেমন শোনায়। এবং রাজার ভূমিকায় শিঙের মতো বিকট শিরস্ত্রাণ-পরা মিশকালো নিগ্রোটিকেও আমার অন্তত বড্ড বেসুরো লাগছিলো (যদিও স্থানীয় বর্ণভেদের প্রতিবাদস্বরূপ এই ব্যবস্থাকে উত্তম বলা যেতে পারে)—তবু, সব সত্ত্বেও, মূল কথাটা ঠিক জায়গায় পৌছলো—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ দিলুম। কিন্তু পৌছলো কার কাছে ? এখানকার সব কাগজে প্রশংসা ক'রে যা সব আজগুবি কথা লিখেছে তাতে বোঝা যায় কেউ কিচ্ছু বোঝেনি, কাল লোকেরা মাঝে-মাঝে যখন 'উপভোগ' ক'রে হাসছিলো সেই হাসি শুনে আমাদের কান্না পায়। আমার ছাত্রদের এক দলকে দেখতে পাঠিয়েছিলুম, একজন বলেছিলো সে নিরাশ হয়েছে, প্রথম অর্ধেক কিছুই বুঝতে পারেনি, তারপর ডস্টয়েভস্কি ধরনের দ্বন্দ্ব আশা করতে গিয়ে ছাখে, সবই অতিশয় সরল। এই কথার দ্বিতীয়াংশে কিছু সত্য আছে—কেউ কিছু বোঝে না তাও নয়। নাটকের প্রয়োজনায় স্থানে-স্থানে বেশ কৃতিত্ব দেখলুম, রানীর ভূমিকায় সূর্যকুমারী (মাদ্রাজের ফিল্ম অভিনেত্রী) খুব ভালো করেছেন, সুরঙ্গমাও ভালো—যদিও আমার মনে হ'লো তাঁর কথাগুলো বড্ড ছাঁটা হ'য়েছে। অভিনয়ের পক্ষে শক্ত নাটক, কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনে কখনো খুব ভালো অভিনয় হয়নি—এঁদের চেষ্টাকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।

এবার মনে হ'লো রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা ব্যক্তিটি অসহ্য—'ডাকঘর' ভিন্ন অন্য সব নাটক থেকে ছেঁটে দেয়া উচিত। জনতার দৃশ্যগুলো আমার মতে কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা। নিউ ইয়র্কের থিয়েটারে সেটা নিছক ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে, আবার হয়তো গম্ভীর হ'তে গেলে নিতান্ত ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠতো। দেখে খুঁত ধরার কাজটা শক্ত নয়। কিন্তু এ-স[illegible] ব্যাপারে কী করলে ভালো হ'তো তা কেউ জিগেস করলেই মাথা চুল[illegible] হয়।

আমার বই বাংলাদেশের তথাকথিত সমালোচকরা কোনোদিনই লক্ষ করেন না—অন্তত গত কুড়ি বছরের মধ্যে করেননি—এই ব্যাপারটাতে আমি এতদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি যে হঠাৎ এর ব্যতিক্রম ঘটলেই অবাক হ'তে হবে। আমি তো একে-একে কাগজের নৌকো জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি—আমার চোখের উপরেই অনেকগুলো ডুবে মরলো, যদি শেষপর্যন্ত আমার কয়েকটা খেলনা দিগন্তকে ধরতে পারে। তাহ'লে তা দেখবার জন্য আমি উপস্থিত থাকবো না তা বলাই বাহুল্য—কিন্তু সে-রকম একটি আশা মনের তলায় উঁকি দেয় না তা বললে মিথ্যে বলা হবে। সত্যি বলতে, সেই আশাটাই সর্বস্ব।……

বু. ব.

[এই পত্রগুচ্ছের কয়েকটি 'অমৃত'-নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে]

দুই মেরু

সত্রাজিৎ দত্ত

অন্তত পরিমাণের দিক থেকে, বাংলা কাব্যরচনার প্রবাহ এখন এতটাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে তাকে প্লাবন না-হোক জোয়ার বলা চলে। তা সত্ত্বেও এই দুটি কবিতার বই হাতে পেয়ে এক প্রবল ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলাম। তরুণ কবিদের গিশগিশে ভিড়ের মধ্যেও এঁদের চিনতে ভুল হয় না। আর এঁরা দু'জন অপর কবিদের থেকে ভিন্নই শুধু নন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় অধুনাতন বাংলা কাব্যের প্রায় বিপরীতমুখী, এমনকি, হয়তো, পরস্পরবিরোধী দুটি কাব্যাদর্শের প্রতিভূরূপে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত গত এক দশকেরও অধিককাল কাব্যরচনায় ব্রতী এবং এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় বহুলভাবে প্রকাশিত ও পঠিত। অর্থাৎ চর্চা ও সাধনায় তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলস্বরূপ তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে এতটাই স্বীকৃত ও গৃহীত যে, 'তরুণ' বিশেষণটির প্রয়োগে তাঁর কবিপরিচয়কে চিহ্নিতকরণও আজ প্রায় অবান্তর ব'লে বোধ হয়। সেইজন্যেই তাঁর প্রথমতম কাব্যগ্রন্থের অতিবিলম্বিত প্রকাশ যে পাঠকের প্রত্যাশা ও ঔৎসুক্যকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তত বর্তমান পাঠকের কাছে এ-প্রত্যাশা (হয়তো অধিকাংশ প্রত্যাশার মতোই) একেবারে আশঙ্কারহিত ছিলো না। অলোকরঞ্জনের কাব্যচর্চায় বিবর্তনের স্পষ্ট লক্ষণ দুর্লভ্য, আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক ব'লে প্রমাণিত হ'লে সুখী হতাম, কিন্তু প্রারম্ভে এ-কথা সবিনয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো যে, 'যৌবন বাউল' আমাদের প্রত্যাশা-পূরণে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়নি ; হয়নি, তার অন্যতম একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, অলোকরঞ্জনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অপরিসীম, কিন্তু অন্যবিধ কারণগুলিও হয়তো উপেক্ষণীয় নয়।

যৌবন-বাউল : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থজগৎ, কলকাতা

অলোকরঞ্জনের কবিতার মনোযোগী পাঠকের কাছে তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় এমন কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়, তাঁর কাব্যচিন্তায় যার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি পাঠকের বিমূঢ় বিস্ময়বোধ উদ্রিক্ত করে; করে, কেননা এই পুনরাবৃত্তির কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ধরা পড়ে না। যে-আনন্দ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা, বিস্ময় আর সর্বজনীন স্নেহ বারবার তাঁর কবিতায় উচ্চারিত, বলাই বাহুল্য জীবন সম্পর্কে তা একটি বিশেষ মনোভঙ্গিজাত। যেহেতু কোনো মনোভঙ্গি সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোনোরকম চরম মূল্যায়ন সম্ভব নয়, সেহেতু সে-সম্পর্কে, আপত্তির কারণ দেখি না; কিন্তু এই ব্যক্তিগত বোধ বা উপলব্ধির সুশোভন বিবৃতিতেই, পুনরুচ্চারণের ফলে, কখনো-কখনো যা প্রায় প্রচার-প্রবণ ব'লে বোধ হয়, নিঃসন্দেহে কবির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। কোনো অনুমিত উপলব্ধি নয়, তৎসম্পর্কিত আশা আর বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণও নয়, কবিতাকে বস্তু হ'তে হয়, হ'তে হয় এমন একটি গাঢ় ঘন নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া যা কবির ক্ষেত্রে যেমন, পাঠকের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি অনিবার্যরূপে অর্জিতব্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতার ধারক। কাব্যপ্রেরণার উৎসস্থলে বোধ বা উপলব্ধির যে-অনুমানগুলি ক্রিয়াশীল, তা এই প্রক্রিয়ার উদ্দীপক উপকরণ মাত্র; উপকরণের অধিক মর্যাদা দিতে উৎসুক ব'লেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কাব্যগ্রন্থের প্রস্তাবনাতেই তাঁর অনুমিত উদ্দিষ্টগুলিকে শপথোচ্চারণের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত না-ক'রে পারেননি। প্রারম্ভেই তাঁকে ঘোষণা ক'রে নিতে হয়েছে 'ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।' কিন্তু কোনো কবির পক্ষে এই ঘোষণার প্রয়োজন কি সত্যিই অনিবার্য?

বস্তুত, অলোকরঞ্জনের কাব্যচিন্তার প্রধানতম লক্ষণই এই সুবিন্যস্ত আস্থাপ্রসূত উচ্চারণভঙ্গি; বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতগুলি আত্ম-কেন্দ্রিক অস্তিবোধ, কতগুলি অনুমিত প্রত্যয়, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস এবং সম্ভাবনার দ্বিধাহীন বিবৃতিতেই তাঁর পরিতৃপ্তি। এই পরিতৃপ্ত প্রত্যয়, বলাই বাহুল্য, পরিপার্শ্ব ও কাল সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ নিস্পৃহতা ভিন্ন সম্ভব নয়। অলোকরঞ্জন নিজেও তাঁর এই নির্লিপ্তি গোপন রাখেননি। অথচ, যদিও রবীন্দ্রনাথের নাম থেকে শুরু ক'রে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নিজের বৈরাগ্যের

স্বীকৃতিতে তিনি অকৃপণ, তৎসত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে এ-সত্যটা আবিষ্কার করা একেবারেই দুরূহ নয় যে, তাঁর 'বাউল'-বৈরাগ্য আসলে তৃপ্ত আত্ম-কেন্দ্রিকতারই আপাত-রূপ: তাঁর এই সচেতন আপাত-মগ্নতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে অকপট আত্মকথনও তাঁর কাছে কখনোই অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না, এমনকি স্থানে-স্থানে নিজের নামোল্লেখেও তিনি যত্নবান। এই সারল্য ঈর্ষণীয়, কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত একটি অনুভূতির সরল অভিব্যক্তিই যদি কখনো কাব্যরচনার একমাত্র উদ্দিষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়, সে-ক্ষেত্রে সেই সরল কবিত্ব শেষপর্যন্ত কবিতা হ'য়ে ওঠে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শিশুমহল' কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। সত্যি বলতে, তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় এই আপাত-সারল্যের অন্তরালে অন্য কিছু আবিষ্কার করতে না-পেরে পাঠক 'আপাত' শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কেই দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন।

সম্ভবত এই শিশুজনোচিত সারল্যই তাঁর বিস্ময়বোধের জনক। তাঁর কবিতায় 'অবাক' এবং 'আশ্চর্য' এই দুটি শব্দের প্রাচুর্য সত্যিই আমাদের অবাক করে; প্রসঙ্গত, জনৈক তরুণ কবিবন্ধুর উক্তি স্মরণ করি: 'এত অবাক তিনি হন কী ক'রে? কোথায় পান তিনি এই অফুরান আশ্চর্যের দেখা, এই অপ্রত্যাশিতের চমক, এই অবিরল বিস্ময়বোধ?'

প্রকৃতপক্ষে, এই বিস্ময়বোধ যে-মানসতার অভিব্যক্তি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কাব্যচরিত্র তারই কেন্দ্রাভিমুখী। এ-বিস্ময় অপ্রত্যাশিতের সম্মুখীন হওয়ার বিস্ময় নয়। বরং তা তাঁর প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত; বিস্মিত হবার জন্যেই যেন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। সম্মুখবর্তী যা-কিছু, তাদের সম্পর্কেই যেহেতু তাঁর অভিপ্রায়, সেহেতু বিস্ময়ের মাধুরী মিশিয়ে সব-কিছুকেই তিনি তাঁর প্রত্যাশার উপযোগী ক'রে গ'ড়ে নেন; হয়তো সে-কারণেই তাঁর কবিতায় স্মৃতির অনুরণনও প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর কাব্য-মানসের এই চরিত্রলক্ষণ একটি বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর কবিতায় বর্তমান এবং অধিকতর মাত্রায় ভবিষ্যৎকালেরই সর্বাঙ্গীণ আধিপত্য, অস্তিবোধই তাঁর তৃপ্তি, শান্তি আর আনন্দের ধারক। আর প্রতিশ্রুতিই তাঁর বিশ্বাসের উপজীব্য। যদিও তাঁর মুখের এই

"'কী জিনিস চাও?' জানালাম: 'গতকল্য'" আমাদের অনুবিধ প্রত্যাশাকে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু বস্তুত তাঁর কবিতায় অতীতকাল অনুপস্থিত। অথচ যা কিছু অতীত, তা-ই তো স্মৃতি; আর এই স্মৃতি আর তাঁর বহুধাবিস্তৃত অনুষঙ্গ, তাঁর আনন্দ, বেদনা, বিষণ্ণতা, যন্ত্রণা, রোষ, ক্ষোভ, আক্ষেপ—এরাই তো একাধারে কবিতার প্রধানতম উপাদান আর অভিব্যক্তি, হয়তো বা জনয়িত্রীও। কখনো-কখনো তাঁর বিবৃতির মধ্যেও স্মৃতির এই দাবি স্বীকৃত হয় ('সমস্ত পৃথিবী তুমি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন ক'রে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর 'স্মৃতির চন্দনা' কোনো অস্পষ্ট অন্ধকারের ঘ্রাণ পাখায় মেখে আনে না; আলোই যেহেতু তাঁর উদ্দিষ্ট (এই 'আলো' শব্দটির ব্যবহার কি অপর্যাপ্ত তাঁর কবিতায়!), সেহেতু স্মৃতির অন্ধ গহ্বর সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন তিনি। 'শান্তি', 'বিশ্বাস', 'আনন্দ', 'খুশি'—এই শব্দগুলি শুধুমাত্র শব্দ হিশেবেই প্রিয় নয় তাঁর কাছে, তাঁর কাব্যানুভূতির কেন্দ্রগত ধারণা হিশেবেও অনিবার্য। সেই জন্যেই তাঁর কাছে, শেষপর্যন্ত, 'যন্ত্রণাও যূথী হয়', হয় 'সৌম্য' এক 'ইমনকল্যাণ', কান্না হয় 'কনক', হয় 'আনন্দমন্দিরা', সেই জন্যেই 'পুষ্প যেমন সুদীপ্ত বিশ্বাসে / কোরকে তার শান্তি রাখে সযত্ন বিন্যাসে' তাতেই তাঁর অভিলাষ। এই সুবিন্যস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যা-ই হোক না কেন, পাঠকের কাছে তা অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়।

অথচ যাকে বলি ইন্দ্রিয়চেতনা, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সেই বিচিত্র সংবেদনক্রিয়াও তো স্মৃতিরই দান। প্রকৃতপক্ষে, তা-ই, স্মৃতিই অভিজ্ঞতা; চেতন অথবা অবচেতন সেই অভিজ্ঞতার গাঢ়, ঘন বস্তুরূপেই কাব্যের উদ্দিষ্ট, শুধুমাত্র বিশ্বাসের বিবৃতি পাঠকের কাব্যঅভিজ্ঞতায় কোনো অভিঘাত সৃজনে অসমর্থ। কিন্তু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সূচনা থেকেই নিশ্চিতির এমন এক ধ্রুব শিখরে আরোহণ ক'রে আছেন, যেখান থেকে পশ্চাদ্‌বর্তী স্মৃতির গূঢ় গহ্বর আর ইন্দ্রিয়ানুভূতির বন্ধুর সোপান অবলুপ্ত ব'লে বোধ হয়; এমনকি, যেখান থেকে, দৃষ্টি যতই সুদূরে মেলে দেয়া যাক না কেন, উত্তরণও আর সম্ভব নয়। এ-কারণেই অলোকরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থে পুনরুক্তি আর পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত যত [illegible] বিবর্তনের লক্ষণ তত স্পষ্ট নয়।

রাবীন্দ্রিক [illegible]ল, ইন্দ্রিয়চেতনা নয়, ইন্দ্রিয়াতীত (নাকি ইন্দ্রিয়বিমুখ?) কোনো [illegible]তায় [illegible]

সম্ভাবনার বোধিই তাঁর কাব্যের ভিতরে বাইরে কাজ করে; সেই জন্যেই 'অভিজ্ঞতার বাইরে যাবো না ভিতরে যাবো না আমি,/চৌকাঠে আমি দাঁড়িয়ে কাঁপবো ভবিষ্যতের দিকে'—এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি বিস্ময়কর হ'লেও নিঃসন্দেহেই স্ববিরোধী নয়। আর সেই জন্যেই, তিনি শব্দব্যবহারে যতটা অনুপ্রাস, ধ্বনিগত লালিত্য, সৌকুমার্য আর কোমলতার পক্ষপাতী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুষঙ্গ সম্পর্কে তার সামান্য পরিমাণও নন। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও তিনি যথারীতি তাঁর অনুসৃতব্য আদর্শ সম্পর্কে ঘোষণায় সোচ্চার ('অনুপ্রাসের অরণ্যে আমি হারাবো আমার পথ')। তৎসত্ত্বেও এ-প্রশ্ন হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাঁর কবিতায় শ্রবণসুখকর অনুপ্রাসের বাহুল্য, সুশ্রী সমাসবদ্ধ শব্দের প্রাচুর্য এবং সুললিত, নরম, কোমল শব্দব্যবহারের অত্যধিক প্রবণতা ভাষাব্যবহারে তাঁর এক ধরনের কুশলতার পরিচয় দিলেও, জ্ঞানমাধুর্য ভিন্ন কখনোই কি তাঁদের অন্য কোনো অনিবার্য যৌক্তিকতা, এমনকি, তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট? তা যদি না হয়, তাহ'লে পাঠকের বিরাগ নিতান্তই যুক্তিসংগত। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো ছবি নয়, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনন্য সংবেদনক্রিয়া নয়, শুধুমাত্র সুশ্রী শ্রবণমধুর শব্দের যে-অরণ্যে তিনি আত্মহারা, তা পাঠককে ক্রমশই ক্লান্ত, ক্লান্ত করে। শব্দের প্রতীকধর্মী বাঙ্ময় ব্যবহারে তাঁর নিরাসক্তিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেহেতু তাঁর কবিতায় স্মৃতি আর অবচেতনার অনুষঙ্গ সর্বতোভাবে অনুপস্থিত, সেহেতু এই নিরাসক্তি একান্তই অনিবার্য। ফলত অলোকরঞ্জনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে অকারণ কাব্যিকতার প্রাধান্য এত বেশি যে, তাঁর কাব্যকে অধিকাংশ সময়েই তা আড়াল ক'রে রাখে। অথচ, যাঁকে লাবণ্য বলি, যদি ধ'রেও নেয়া যায় যে, কাব্যশরীরে সেই লক্ষণ সঞ্চারিত করা কবিকর্তব্যের অন্তর্ভূত, তাহ'লেও, 'দ্বিধার দরিয়া', 'বিভোর বিভা' ইত্যাদির ব্যবহার, এমনকি, কোমলতার প্রয়োজনে অনেকক্ষেত্রেই ঈ-কার অথবা আ-কার যোগে শব্দকে নারীত্বদান করাই কি তাঁর প্রকৃষ্ট পথ? 'সমস্ত প্রাণ বকুলবেদী'ই তো যথেষ্ট, তারপরেও কেন আবার 'বকুলছাওয়া!' কাব্যিকতা যে সর্বতোভাবে কবিত্ববিরোধী—অলোকর[illegible] কবিতায় এই সর্বজনস্বীকৃত প্রস্তাব পুনর্বার প্রমাণিত হ'লো।

প্রসঙ্গত, এই পুরোনো উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে আমার সংকে[illegible]

না-ক'রে পারছি না যে শব্দের অর্থ, ধ্বনি, অনুষঙ্গের যে-প্রচলিত বহিরঙ্গ তাকে স্বীকৃতি দিয়েই তার নির্মোকের অন্তরালবর্তী গূঢ় অন্তঃসারটুকু আবিষ্কার করা ভিন্ন শব্দের নতুন অর্থ অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব, আর নতুন অর্থ অর্জন ভিন্ন শব্দকে কবির অনন্য মানসপ্রক্রিয়ার ধারক হিশেবে ব্যবহার করার অন্য পথ কই ?

কাব্যাদর্শ সম্পর্কে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর আরেকটি সিদ্ধান্তও আমাকে বিমূঢ় করেছে। 'সমস্ত তোমার দেশজ ভাণ্ডার, তুমি দয়া ক'রে বাইরে যেয়ো না' এই বোধ যে বস্তুতই তাঁর কাব্যধারণার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর কবিতায় তার অবিরল সমর্থন মেলে। শুধুমাত্র দেহাতি, সাঁওতালি, গ্রামীণ বাংলাই নয়, লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর মুগ্ধ আকর্ষণ তিনি গোপন রাখেননি। শহর-নগর সম্পর্কে তাঁর বিরাগ শুধু এই জন্যেই নয় যে, যা মূর্তিমতী বাংলাদেশ তা কেবল গ্রামবাংলাতেই সীমাবদ্ধ, তিনি তাদের প্রধানত গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ শক্তি হিশেবেই গণ্য করেন, এই জন্যেও। সুতরাং 'চাষীর জীবনশৈলী'ই তাঁর 'স্বর্গসাধন', তাঁর 'জীবনশিল্প' রূপে গৃহীত। আর সেই জন্যেই মাতৃপ্রেমের (জননী ও জন্মভূমি, দুই অর্থেই) মর্মান্তিক মোহাবেশে আজও তিনি আচ্ছন্ন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। সর্বত্র তিনি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হননি ব'লে তাই ক্ষুব্ধ বোধ না-ক'রে পারিনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-কথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর কাব্যগ্রন্থপাঠে আমাদের এ-প্রত্যয় দৃঢ়তর হ'লো : আধুনিক বাংলা কাব্যধারার তিনিই যোগ্যতর তরুণ উত্তরসাধক। ছন্দ, মিল ও আঙ্গিকের বিবিধ প্রকরণে তাঁর অসামান্য দখল রীতিমত আকর্ষণীয়, আকর্ষণীয় তাঁর প্রতিটি কবিতার আভ্যন্তরীণ সংহতি। তাঁর কবিতার গঠনে যে-নৈপুণ্য লক্ষিত হয়, তরুণ কবিগোষ্ঠির মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল ; প্রথম পংক্তি থেকে শুরু ক'রে অনিবার্য ক্রমবিকাশের যে-প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে শেষ পংক্তির নিশ্চিত পরিণতিতে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ হয়, তা তাঁর কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। যেহেতু তাঁর [illegible] পরিণতমানস, সৎ নিষ্ঠাবান কবি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল, রাবীন্দ্রিক [illegible]র ত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমাহীন হওয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের [illegible]তায় [illegible] অন্তর্ভূত ব'লেই গণ্য করি।

পরিশেষে, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ত্বরান্বিত হোক এই প্রার্থনা জানাই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তিমান কবি। তাঁর বিশিষ্ট ও অনন্য কবিচরিত্র সাম্প্রতিক কালের বাংলা কাব্যে একটি স্বতন্ত্র সুর যোজনা করেছে—সৃষ্টি করেছে, হয়তো, এক অর্থে, একটি নতুনতর কাব্যরীতি। উচ্ছ্বাস এবং বিরাগ, নিন্দা এবং প্রশংসার যে-বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় তিনি বাঙালি পাঠক-সাধারণকে উদ্দীপিত করেছেন, তাতে অন্তত এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ভিন্নতর কাব্যাদর্শের বাহক হিশেবে তাঁর কবিতা বাঙালি পাঠকের মনোযোগকে বেশ প্রবলভাবেই আকর্ষণ করে।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থটি আকৃতিতে ক্ষুদ্রায়তন হ'লেও তা থেকেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যাদর্শের স্বরূপ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা সম্ভব। তাঁর কবিতা সুস্পষ্টরূপে যে-লক্ষণগুলি দ্বারা আক্রান্ত তা যে অলোকরঞ্জনের অনুসৃত আদর্শের বিরোধী সে-কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে ; কাব্যগ্রন্থ দুটি পাশাপাশি রাখলে এ-বৈপরীত্যের সর্বতোমুখিনতা রীতিমত চিত্তাকর্ষক ব'লে বোধ হয়। শুধুমাত্র তাঁর কাব্যমানসই নয়, তাঁর বাকৃভঙ্গি, শব্দ ও ভাষাব্যবহারেও যে-প্রবণতা লক্ষণীয়, তা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক জগতের কবি হিশেবে চিহ্নিত করে। স্মৃতির সংবেদন আর ইন্দ্রিয়চেতনার অনুষঙ্গে সন্তপ্ত সংরক্ত এই জগৎ এমন এক বোধের পরি-মণ্ডল দ্বারা ভারাক্রান্ত, নিশ্চিতরূপে আধুনিক কাল আর তার মানসতাই যার অনিবার্য উপাদান। তাঁর কবিতায় রোষ, ক্ষোভ, ঘৃণা, আক্ষেপ, যন্ত্রণা, বেদনা যে-তীব্র, তীক্ষ্ণ আবেগে স্পন্দমান স্মৃতির অন্ধ অস্পষ্ট পশ্চাদ্‌পটই তার উৎসভূমি। তাই 'আলো' নয়, 'অন্ধকার'ই তাঁর অভিজ্ঞতার স্বরূপকে সূচিত করে। (শুধুমাত্র এই দুটি শব্দের অনলস ব্যবহারের মধ্যেই হয়তো আলোচ্য কবিদ্বয়ের ভিন্ন মানসতার একটি লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।) বস্তুত, তন্দ্রা আর স্বপ্নের গূঢ় প্রকরণের মধ্যে দিয়ে স্মৃতিই যেহেতু [illegible] হানা দিয়েছে তাঁর কবিতায়, মথিত করেছে তাঁর ইন্দ্রিয়চেতনা [illegible] কবিতায় 'স্বপ্ন, স্মৃতি' এই শব্দ দুটির অপর্যাপ্ত ব্যবহারও লক্ষণী[illegible]

নির্বাচনে তাঁর প্রধানতম প্রেরণাই স্মৃতি আর মগ্নচৈতন্যের সেই সব সুতীক্ষ্ণ অনুষঙ্গ, ইন্দ্রিয়কে যা সোজাসুজি আঘাত করে। 'তবু প্রেত এক নিয়েছে আমার পিছু' এই বোধ দ্বারা তাঁর চেতনা এতটাই সমাচ্ছন্ন যে, 'চৌকাঠে দাঁড়িয়ে' ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি মেলে দেবার সামান্যতম প্রবণতা তাঁর কবিতায় লভ্য নয়। শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্র সংবেদনক্রিয়ায় যে-অতীত বারবার তাঁর ইন্দ্রিয়চেতনাকে অনুরণিত করেছে, তা-ই তাঁর কাব্যঅভিজ্ঞতার ধারক। শব্দব্যবহারে তাঁর প্রখর ইন্দ্রিয়ময়তা সেই জন্যেই তাঁর কবিতার অনিবার্য উপাদান হিশেবে প্রতিভাত।

শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে আপাত-অব্যবহার্য যে সব নির্ভেজালভাবে অকাব্যিক, দেশজ, কথ্য, কখনো-কখনো নিঃসন্দেহে অশালীন শব্দকে তিনি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন, তা স্পষ্টতই অধিকাংশ তরুণ কবির মতো, তাঁর জীবনানন্দীয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কাব্যধারণাকেই সূচিত করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্যরচনায় এই উত্তরাধিকারকে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি, প্রয়োজনবোধে, নিঃসন্দেহে যা জীবনানন্দীয় এমন বাগ্‌ভঙ্গি ও শব্দকেও তিনি সোজাসুজি ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সচেতন ব্যবহার তাঁর স্বকীয়তাকেই উজ্জ্বলতর করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই কবিতাংশটি লক্ষণীয়,

> 'পরাগের বিষে কাঁপি হলুদ বিষণ্ণ করজালে ;
> সুদীর্ঘ লোহার গন্ধ নেড়ে দেয় মগজের খড়।
> হেমন্ত, যা কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো—
> মড়কে, সাহিত্যে মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশে।' (তুমি যেন ধর্ম)

কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কথ্য, অকাব্যিক শব্দ-ব্যবহারের উল্লিখিত প্রবণতা অতিরিক্তও অত্যধিক ব'লে প্রতিভাত হয় এবং পাঠকের বিভ্রান্তির কারণ হয়। কখনো-কখনো এই প্রবণতা দ্বারা তাঁর শব্দসমূহ এতটাই অধিকৃত যে, মনে হয় যেন সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত [illegible]সাহসী ব্যবহারে পাঠককে চমৎকৃত (কিংবা চমকিত) করার তৃপ্তিই রাবীন্দ্রিক-[illegible] এই উপভোগস্পৃহার মধ্যেই যেন তাঁর কতগুলি অকাব্যিক, স্থূল, [illegible]তায় [illegible] অন্তয়তো যা, এমনকি, প্রায় অকথ্যই) শব্দব্যবহারের একমাত্র

যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। সে-সব ক্ষেত্রে শব্দব্যবহারের অন্যবিধ অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর অসচেতনতা পাঠককে পীড়িত করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই যেখানে শব্দব্যবহারের উদ্দেশ্য, সে-ক্ষেত্রে শালীনতা বিষয়ে কোনো-রকম শুচিবায়ুগ্রস্ত অভিযোগ আমাদের কাছেও মূঢ়তা ব'লে বোধ হয়। কিন্তু শব্দের এই অকাব্যিক স্থূলত্বই যদি তাদের প্রতি কবির আকৃষ্ট হবার একমাত্র কারণ ব'লে গণ্য হয়, যদি কবিতাটির মধ্যে ঐ শব্দসমষ্টির অন্যবিধ অনিবার্যতার অভাব প্রকট হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে পাঠকের বিরক্তিবোধ স্বাভাবিক ও সংগত। অথচ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনো-কোনো কবিতাপাঠে পাঠকের এ-রকম ধারণা হয় যে, কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের স্পর্ধিত ব্যবহারই তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য যার ফলস্বরূপ তিনি একটি কবিতারচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবিতাটির আভ্যন্তরীণ শৈথিল্য, অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ গঠন, যুক্তি অথবা বোধের কোনো-রকম ক্রমবিকাশ ও পারম্পর্যের অভাব পাঠকের এই সন্দেহকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ 'জন্ম এবং পুরুষ', 'সতীদেহ', 'স্বকৃত আলেখ্য' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে তুলে ধরা যায়।

অর্থাৎ, অতিরিক্ত কাব্যিকতা যে কবিত্ববিরোধী, এই প্রস্তাব মর্মে-মর্মে উপলব্ধি ক'রে সে-সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া এতটাই তীব্র হয়েছে যে, সব ক্ষেত্রে তিনিও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। অকাব্যিক হবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় কখনো-কখনো তাঁর কবিতা থেকে কাব্যের সমস্ত লক্ষণগুলি এমনভাবে তিনি নির্মূল করেছেন যে শেষপর্যন্ত যা রচিত হয়েছে তাকে কবিতা ব'লে চিহ্নিত করারও আর-কোনো উপায় থাকেনি। অথচ, এই সচেষ্ট ভঙ্গি থেকে যখনি তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন, তখনি তাঁর স্মৃতিচারণ সার্থক অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। যা-কিছু বিবর্ণ, পুরোনো, পাংশু, ম্লান, ধূসর, ধূলিমলিন, ক্লান্তিকর, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, দুঃখী, শোকার্ত, যন্ত্রণাকাতর এবং অন্যদিকে দুঃস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত, কীটদষ্ট, ঘৃণ্য, গ্লানিকর, পাপী, তা-ই যেহেতু বেদনাবিদ্ধ প্রেতের মতো তাড়া ক'রে-ফের[illegible] তাঁকে ('কে পশ্চাতে বেদনার গান গাও'), যেহেতু এর থেকে[illegible] তাঁর পক্ষে আর সম্ভাব্য ব'লে বোধ হয় না, সেহেতু যাবার[illegible] সত্ত্বেও ('এ মূল বনের হরিণ যাবো কোথায়, কেমন দিকে[illegible]

নিজের অতীতেই তাঁকে ফিরে আসতে হয় ('যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি')। তাঁর কৈশোর আর বাল্য আর শৈশব বারে-বারেই তাঁর স্মৃতিকে আক্রান্ত করে; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এই প্রত্যাবর্তনের বোধ, এই ফিরে-আসা যে কি অজস্রবার উচ্চারিত তা যে-কোনো পাঠকই লক্ষ না ক'রে পারবেন না। তাঁর এই স্মৃতির জগতে সব-কিছুই ম'রে যায়, সব-কিছুই ঝ'রে যায়; ঝ'রে যায় শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্র সব উপকরণ, ঝ'রে যায় ফুল, পাতা, নক্ষত্র। যা স্মৃতি, তা-ই তো মৃত; তাই মৃত্যু, আর মৃত্যুর অনিবার্য অনুষঙ্গ ধ্বংস, ক্ষয় আর বিলুপ্তির বোধেও তিনি আক্রান্ত। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটি তাঁর এই কাব্যচরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত হিশেবে লক্ষণীয়।

> 'আমি বহুদিন হোলো ব'সে আছি। হেমন্তের ব্যাধি
> আমারে দিয়েছে মৃত পরাগের বিলীন সম্পদ।
> ক্ষয়ের অমরামতী, শুধু ঝরা, ব্যর্থ ধ্বনিপাত—
> একান্ত মুখের স্বপ্ন, হায় চোখ প্রয়াসে নিরত
> খুঁজে পাবে কোনোদিন?'
>
> ('হেমন্তে')

স্বপ্ন আর স্মৃতির মগ্নচেতনাই যেহেতু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের প্রধানতম উপজীব্য, সেহেতু প্রতীকধর্মিতা তাঁর শব্দ এবং ভাষাব্যবহারের অনিবার্য চরিত্রলক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শব্দের প্রতীকী ব্যাখ্যা বিশেষ প্রাসঙ্গিক মনে করি। তাঁর কাব্যচেতনা যে-কয়েকটি বোধ দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত তার মধ্যে সবচেয়ে অবিরলভাবে যা তাঁর কবিতায় বারে-বারে উপস্থিত হয়েছে, তা হ'লো জল। স্বপ্নদৃশ্যে জলের ভূমিকা যে সর্বদাই গর্ভের অন্তরাল অথবা জন্মাবস্থাকে সূচিত করে, এই মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত আজ প্রায় সর্ববাদীসম্মত একটি গৃহীত ধারণা; স্মৃতির সুড়ঙ্গ ধ'রে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ পশ্চাদ্‌গমন সম্ভব, তা গর্ভের অন্তরাল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই, [illegible] ...ই শব্দটি যে-অবচেতন ধারণার প্রতীক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের রাবীন্দ্রিক [illegible] ...র সঙ্গে তা সুস্পষ্টরূপেই সম্পৃক্ত।

...তায় [illegible] অ... সাধু অথবা 'বসেছিনু' ইত্যাদি পদ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ক্রিয়াপদের

ব্যবহার এবং বিভিন্ন শব্দের বানানে প্রাচীন রীতির প্রতি পক্ষপাত (পুরানো, ধুলা ইত্যাদি) সম্ভবত এই কারণেই যে, স্মৃতি এবং তৎসম্পর্কিত বোধের অনুজ্জ্বল প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট করতে এই বাগ্‌ভঙ্গি বিশেষ সহায়ক। যদিও সব ক্ষেত্রেই তাঁর এই প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট নয়, (অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেও মনস্থির করতে পারেননি ব'লে মনে হয়, 'পুরানো' এবং 'পুরোনো'— এই দুই বানানই তিনি সমপরিমাণে ব্যবহার করেছেন) কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস আমাদের কাছে তাঁর কাব্যচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছে। প্রথমত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি।

'দেবতার গ্রাস' কবিতাটিতে 'নৃত্যে রুগ্ন ব্যথিত জানেলা খুলে দিয়ে কথা বলি' এই পংক্তিটি লক্ষণীয়। এখানে 'জানেলা' এই বানানের ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন নয়। শব্দের দৃশ্যরূপের সঙ্গে, শব্দটি যে-বস্তুর প্রতীক, তার একটি দৃশ্যগত সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মানসিকতায় অনিবার্যরূপে, যদিও সর্বদা সচেতনভাবে নয়, নির্ণীত হ'য়ে থাকে। জানালা শব্দটিতে আ-কারের যে-বাহুল্য তার ফলে এই শব্দটির দৃশ্যরূপে জানালা নামক একটি উন্মুক্ত বর্গাকার ক্ষেত্রের সাদৃশ্য আরোপিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে 'রুগ্ন' এবং 'ব্যথিত' এই দুটি বিশেষণে চিহ্নিত জানালাটির ভিন্ন প্রকৃতিই কবির উদ্দিষ্ট, তাই, এ-কারের প্রয়োগে এই বর্গক্ষেত্রটিকে এমনভাবে নুইয়ে দেওয়া হ'লো যা বিশেষণ দুটির যাথার্থ্যকেই অধিকতর পরিস্ফুট ক'রে তোলে।

শব্দব্যবহারে এই সচেতন প্রয়োগই যেহেতু তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণ সেহেতু অনুপ্রাসের অকারণ তরলতা প্রায় কখনোই তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং সারিবদ্ধ অন্ত্যমিলের নিপুণ ব্যবহারে এমন এক শ্লথ ছন্দোময়তা তিনি কখনো-কখনো রচনা করেন যা তাঁর কবিতার স্মৃতি-সন্তপ্ত বিষণ্ণ পরিমণ্ডলকেই আরো ঘনীভূত করে। 'কি নীল খোলে না দ্বার, হাতে যার অপেক্ষার বিশাল বিফল দুঃখ তার বুকে ভেসে' কিংবা, '[illegible] তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে'র মতো পংক্তি [illegible] পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত করে, তার অভিঘাত এড়ানো তাঁ[illegible] অসম্ভব। তাছাড়া, তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই শব্দ এব[illegible]

ঘুরে এমনভাবে পুনরাবৃত্ত হয় যে, গানের ধুয়োর মতোই পাঠকের ইন্দ্রিয়-চেতনায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে।

শব্দ এবং ভাষাব্যবহারে তাঁর এবম্বিধ নৈপুণ্য সত্ত্বেও, বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ, বাক্যবন্ধ, পংক্তি অথবা অনুচ্ছেদে তাঁর কাব্যমানসের যতটা সচেতন পরিচয় পাওয়া যায়, কবিতার আভ্যন্তরীণ সংহতি তাঁর মনোযোগকে ততটা আকৃষ্ট করে না। ফলত অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন গঠন পাঠককে পীড়া দেয়। এ-সম্পর্কে তাঁর ঔদাসীন্য তাঁর 'উৎক্ষিপ্ত কররেখা' নামক কবিতাংশগুচ্ছই প্রমাণিত করে; নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবিতাংশকে মুদ্রিতাকারে পাঠকের কাছে তুলে ধ'রে 'অলিখিতের দিকে নির্দেশ' করার অযৌক্তিক প্রলোভন তিনি এড়াতে পারেন না। কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু কোনো কবিতাংশ কাব্যদেহের অনিবার্য অংশ ব'লেই গৃহীত এবং যেহেতু ছিন্ন কবিতাংশের কোনো স্বাতন্ত্র্য নিরস্তিত্ব ব'লে বোধ হয়, সেহেতু অলিখিতের প্রতি তাঁর এই দিক-নির্দেশের অবাস্তবতা আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে। এমনকি, তাঁর এই কবিতাংশগুলির কিছু-কিছু যদি তিনি একত্রীভূত ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনার দাবি জানাতেন, তাহ'লে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার যে-পারম্পর্যহীনতায় আমরা অভ্যস্ত, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই অবিশ্বাস্যতা মেনে নেয়াও হয়তো আমাদের পক্ষে সহজতর হ'তো।

শেষ করার আগে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি। শব্দ ও বাক্যবিন্যাসে, অন্তত ভঙ্গির দিক থেকে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুকারকের সংখ্যা যে স্বল্প নয়, এই সত্যের উপলব্ধি হয়তো তাঁর পক্ষে বিশেষ আত্মতৃপ্তিরই সংগত কারণ হ'তে পারে, যদি-না তিনি নিজেও শেষপর্যন্ত নিজেকে অনুকরণ করার দুর্দম মোহাবেশে আবিষ্ট হ'য়ে পড়েন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে বিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও এ-সন্দেহ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত [illegible] পারিনি যে, নিজের অনুসৃত বাগভঙ্গি ও কাব্যরীতি পুনরাবৃত্তির ফলে [illegible] যশ তাঁকে এমনি এক বদ্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন করেছে যখন ভঙ্গির রাবীন্দ্রিক[illegible]ল হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। যে-কবিতাগুলি তাঁর এই বদ্ধসংস্কারের [illegible]নায় [illegible] ব্যতিক্রম হিশেবে আমাদের মুগ্ধ করেছে, 'প্রতিকৃতি',

'কারনেশন', 'চতুরঙ্গ', 'অনিবার্যতা', 'সখ্য', 'পাখি', 'হেমন্তে' এই কবিতা ক'টি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে আমাদের আকর্ষণকে যে তীব্রতর করেছে, এই স্বীকৃতি জানাচ্ছি। তাঁর কবিত্বশক্তি সম্পর্কে আমাদের আস্থা নিঃসংশয় ব'লেই অতৃপ্তির উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে—হয়তো বলাও বাহুল্য মাত্র।

পরিশেষে, একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কবিতাকে 'পদ্য' ব'লে অভিহিত করার কফি-হৌসী কায়দা কেন তাঁকে প্রলুব্ধ করে? মৌলিকতা বা অভিনবত্ব প্রদর্শনের এই শস্তা পথে তাঁর কি কখনোই প্রয়োজন হয়, যাঁর স্বাতন্ত্র্য সন্দেহাতীত?

আলোচনা

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য

'কবিতা'-র গত সংখ্যায় শ্রী অমিয় দেবের প্রবন্ধ প'ড়ে গদ্যলেখক সুধীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না; অনেক সুন্দর-সুন্দর বিশেষণ এবং উপমার ফাঁকে এটুকু বোধগম্য যে তাঁর বক্তব্যের যেখানে শুরু, সেখানেই শেষ। সুধীন্দ্রনাথ 'কোবিদ অথচ পণ্ডিত নন,' তাঁর 'বুদ্ধি অনুভূতির অসহযোগে বল্মীক গড়েনি', তাঁর 'প্রতিটি প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হয়, বুঝি শব্দ গেঁথে-গেঁথে যুক্তি এক প্রকাণ্ড ইমারত গ'ড়ে তুলছে,' তাঁর 'গদ্যে চিন্তা কখনো পাল তুলে দিয়ে নিরুদ্দেশের পাড়ি জমায় না, কিংবা ভাব আবেগের পাখায় ভর ক'রে ভেসে বেড়ায় না,' 'তাঁর রচনাবলী হয়তো সর্বত্র অন্তরঙ্গ সুরে বাজেনি, কিন্তু যুক্তি ও চিন্তার তালে-তালে নেচে উঠেছে' ইত্যাদি লাইন যে-কোনো সার্থক এবং চিন্তাশীল লেখকের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কথার কথা, ধরুন, কোনো সমালোচক যদি উক্ত মন্তব্যগুলি রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে প্রয়োগ করেন, তবে কি তা বেমানান হবে? আসলে এ-জাতীয় প্রবন্ধে পাঠকের প্রত্যাশা থাকে লেখকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সাহিত্যিক কৃতিত্ব নিরূপণ। কিন্তু সে-আলোচনায় শ্রী অমিয় দেব প্রচলিত জনশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে তৎসম শব্দের বাহুল্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটাই কি তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব? শ্রী অমিয় দেব মনে করেন, 'আশ্চর্য সংযম তাঁর শব্দপ্রয়োগে। প্রায়শই তিনি পাঁচটি দেশী শব্দের পরিবর্তে একটি তৎসম শব্দে কাজ চালাতেন।' পাঁচটি দেশী শব্দের পরিবর্তে যদি একটি তৎসম শব্দে কাজ চালানো যেতো, তাহ'লে অনেকেই করতেন। আসলে এ-জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবই নয়। তৎসম হ'লো বাংলা শব্দভাণ্ডারের মৌলিক পর্যায়ের, আর দেশী শব্দগুলি হ'লো আগন্তুক বা গৃহীত। অধিকাংশ তৎসম শব্দের কোনো 'দেশী' প্রতিশব্দই নেই, পাঁচটার [illegible] একটা ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। গেলাশ, বাসন, আলপিন [illegible]য়েকটি 'বিদেশী' শব্দের মতো ভাব, ডিঙি, ঢোল, ঢিল ইত্যাদি [illegible]র কয়েকটি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে—তাকেই বলে দেশী

শব্দ। শ্রী অমিয় দেব অন্যত্র বলেছেন, 'সন্ধি এবং সমাস তাঁর শব্দাবলীতে যে ঘনসংবদ্ধ ব্যূহ রচনা করেছে, তার তুলনা বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিরল।' যে-সব সাহিত্যিকের রচনায় সুধীন্দ্রনাথের অনুরূপ তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে, তাঁদের সবারই সন্ধি এবং সমাসের আনুগত্য অসাধারণ। অমিয়বাবু যদি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন তবে খুশি হবো। কিছু পরেই তিনি আবার বলেছেন, 'কেবল যে তাঁর শব্দভাণ্ডার তৎসমপ্রধান তা-ই নয়, অর্থপ্রবাহেও তৎসমমুখী।' মানে কি? তিনি কি বলতে চান যে সুধীন্দ্রনাথের পূর্বসূরিরা তৎসম শব্দের অপপ্রয়োগ করেছিলেন?

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্য তাহ'লে কি? এ-আলোচনার পূর্বে বীরবলী স্টাইলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য-নির্দেশ প্রয়োজনীয়। আমরা সবাই জানি বাংলা চলিত ভাষাকে সাহিত্য-মর্যাদা দিলেন প্রমথ চৌধুরী। সাধু-চলিত-ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের; সুধীন্দ্রনাথ চলিত ভাষার উক্ত লক্ষণগুলি মেনে নিলেও একটি ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে এগিয়ে গেছেন। 'যৌগিক ক্রিয়ার' পৌনঃপুনিকতা যে বাংলা গদ্যের দৌর্বল্যের অন্যতম কারণ এ-কথা প্রমথ চৌধুরীও বুঝেছিলেন। 'করিয়াছে,' 'খাইয়াছে' ইত্যাদি দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি শুধু শ্রুতিকটুও নয়, শিথিলও। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এ-বিষয়ে সচেতন হ'য়েও অন্য উপায় আবিষ্কারে সফল হননি। সেজন্য যৌগিক ও সমাপিকা ক্রিয়ায় বাক্যান্ত তাঁর বহু রচনায় সুলভ। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে: 'ভাষামাত্রেরই তার আকৃতি ও গঠনের মতো একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে। বঙ্গভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাব বশতই আমরা সে-ভাষাকে সংস্কৃত করতে গিয়ে বিকৃত করে ফেলি। তাছাড়া প্রতি ভাষারই একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে যা বাংলার সুরে মেলে না এবং শোনবামাত্র কানে খট্ ক'রে লাগে (বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা)।'

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গোড়া থেকেই [illegible] হয়েছিলেন। তাঁর গদ্যে ক্রিয়াপদের নিপুণ প্রয়োগ বিশেষভাবে [illegible] তিনি বিশেষণ, বিশেষ্য, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি পদপ্রকরণকে [illegible]

দিয়ে ক্রিয়াকে ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'স্বগত'-এর সূচনাই নেয়া যাক:

'বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য ব'লে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরাজী ভাষার বর্ণসংকর ঘটিয়ে আমি যে অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরের অভাববশতই আমি যেকালে গুরুজনদের ভৎসনাভাজন, তখন ওই অহৈতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।'

আরো স্থূলভাবে বলা যেতে পারে কোনো পরীক্ষার্থী প্রমথ চৌধুরীর চলিতভাষাকে অনায়াসেই সাধুভাষায় রূপান্তরিত করতে পারবে, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের গদ্য আদৌ চলিত ভাষায় লিখিত কিনা তা নির্ণয় করতেই অনেক সময় চ'লে যাবে। সুধীন্দ্রনাথ চলিতভাষার ব্যাকরণ মানলেও সাধু-ভাষার সংহতি তাঁর লক্ষ্য ছিলো। প্রমথ চৌধুরী গদ্যে কৃষ্ণনগরীয় বা ভাগীরথীতীরবর্তী বাগ্‌ধারা অনুসরণের বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা তাঁর আদর্শ সোজা অথচ বৈঠকী ঢঙে আলাপ। কথ্যভাষার মেজাজটি তিনি অবলোপ করতে চাননি। অন্যদিকে গোড়া থেকেই সুধীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট দার্ঢ্য। তাই বীরবলের অনুকরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রমথ চৌধুরী বিনা দ্বিধায় তৎসম শব্দের পাশেই তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন (যেমন বৃদ্ধ বয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন, চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে ইত্যাদি), কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা অচিন্তনীয়। সুধীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের গতানুগতিকতা এড়াবার জন্য ইংরেজি অন্বয় বা বাগধারা সোজাসুজি এনেছেন। কলাকৈবল্য,*

---

* বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'অল্পবয়সীরা জানেনও না যে অন্বিষ্ট, অভিধা, ঐতিহ্য, প্রমা, প্রতিভাস, অবৈকল্য, ব্যক্তিস্বরূপ, বহিরাশ্রয়, কলাকৈবল্য প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ—যা তাঁরা হয়তো কিছুটা যথেচ্ছভাবেই ব্যবহার করছেন—এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে।' এ…ল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা শব্দবন্ধগুলি বাদ দিলে উক্ত শব্দসমূহ বাংলায় পূর্ব-…য়েক প্রতিভাস, প্রমা ইত্যাদি দার্শনিক পরিভাষাগুলি রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের রচনায় দুর্লভ নয়, …ব্দের ব্যবহারও আগে ছিলো। 'Tradition' অর্থে 'ঐতিহ্য' কথাটি রবীন্দ্রনাথের চয়ন… এমন কি সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'তনুবাত শিখরে'র তনুবাত কথাটিও তাঁর। বস্তুত

নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন, তনুবাত শিখর এ-জাতীয় শব্দপ্রয়োগের কৃতিত্ব কেবল তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে নয়, তৎসম শব্দের সাহায্যে ইংরেজি অন্বয়ে বাক্যগঠনে। নঙর্থক শব্দের প্রয়োগেও ইংরেজির প্রভাব লক্ষণীয়। 'Absent' অর্থে 'অনুপস্থিত' সুধীন্দ্রীয় প্রভাব। 'সন্দেহ নেই'-এর পরিবর্তে 'নিঃসন্দেহে'র বহুল প্রয়োগের জন্য তিনিই প্রধানত দায়ী।

আমার বক্তব্য আরো স্পষ্টভাবে বোঝানো যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী কথ্যরীতি ও সহজবোধ্যতার পক্ষপাতী। কিন্তু তৎসম শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করলে শুধু শব্দভাণ্ডার শীর্ণ হয় তা নয়, নতুন নতুন শব্দসৃষ্টির সম্ভাবনাও আর থাকে না। কেননা প্রাকৃত বাংলার এ-ক্ষমতা নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব'-র ভূমিকায় এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, 'শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাঙলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাঙলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। "প্রার্থনা" সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাঙলা প্রতিশব্দ "চাওয়া"। "প্রার্থিত", "প্রার্থনীয়" শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাঙলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক "চায়িত" ও "চাওনীয়" বাঙলায় চালাইবার প্রস্তাবমাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্যপদকে বাঙলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলায় এ পর্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গিয়াছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।' এই কারণে সুধীন্দ্রনাথ রচনারীতিতে চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহার করলেও তৎসম শব্দকেই প্রধানত আশ্রয় করেছিলেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছিলো সব রকম ভাবনার বাহন হিশেবে বীরবলীয় রীতি আদর্শ নয়। তাঁ…

সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তিনি উক্ত শব্দসমূহকে অবলম্বন ক'রে ইংরেজি বাগ্‌ধারা বা প্র… অনুবাদ করেছেন,—কখনো ইংরেজি অন্বয়ে, বাক্যগঠনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে… থেকে 'কৈবল্যে'র নিষ্পন্নের জন্য নয়, Art for Art's sake-এর বাংলা … ব্যবহারেই শব্দশিল্পী সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধি।

ভাষায় বলা যেতে পারে, '(প্রমথ) চৌধুরী মহাশয় শ্রমলাঘবের লোভেই ক্বচিৎ-কদাচিৎ বিদেশী বাক্যের শরণ নেন বটে, তবু বাঙলার বাচনিক পদ্ধতিতে যে-বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, তার প্রতি সাধারণত তিনি বিমুখ। সুতরাং তাঁর প্রসাদগুণ বিকলনের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং বাঙালীর কান বাদী-বিবাদীর ঐকতানে অনভ্যস্ত ব'লে তিনি সাধ্যপক্ষে অনেকান্ত ভাবনা এড়িয়ে চলেন। ফলে তাঁর উক্তি সর্বদাই ক্ষুরধার, কিন্তু সর্বত্র সুসংবদ্ধ নয়।' সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আমার মনে হয় তাঁর সম্পর্কে এ-জাতীয় আলোচনা অসম্পূর্ণ।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাঁর গদ্যের অনুকারক স্বভাবতই স্বল্প হ'লেও অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। সেজন্য আশা করা যায় ভবিষ্যতে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়ে আরো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশিত হবে।

সুবীর রায়চৌধুরী

বিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বহু

KAVITA, Vol. 25, No. 3. Serial No. 104

"........ এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।"

বীন্দ্র শতবার্ষিকী ১৩৬৮

R. N. 5167/57